শাল - ফুল

মানিকলাল সিংহ

ঠাকুরদাস লাইব্রেরী * * * ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট.
* * * কলিকাতা—৯ * * *

না। যেখানে ধর্ম থাকবে না······সমাজ থাকবে না ··· জাত থাকবে না ··পাপী তাপী দোষী অপরাধী থাকবে না···· সেই পরিবর্তনের সাধনায় বহুত্যাগ হয়ত করতে হবে।

যে আগুন জ্বলে সমস্ত কৃত্রিমতা নষ্ট করবে,······যে আলে সমস্ত অন্ধকার অপসারিত করবে মহুয়া, দেবীদা, গৌরী ··· তার এক একটি স্ফুলিঙ্গ।

মানুষের ভাগ্য আবার ভাগ্য দেবতার নির্দেশেই একদিন বদলে যাবে···তার অপেক্ষায় আছে অগণিত মানুষ।

সেদিন কোন ধর্ম মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবে না ·· সেদিন কোন যন্ত্র দানব কারো গোলাম হয়ে ··অসংখ্য মানুষের মাথা চিবিয়ে খাবে না···সেদিনের সাধনায় রাতের তপস্যা চৈত্রের সোনালী ভোরে ঝলসে উঠবে·· অফুরন্ত পরাগমেশা রূপালী শাল ফুলের সুন্দর গুচ্ছোগুলো··· ··ঐ লালমাটির বুকে। বুনো বাতাসে ছড়িয়ে যাবে ফোটা শাল ফুলের অন্তরের বার্তা······তারি নিমন্ত্রণ দিকে দিকে······দেশে দেশে······ জগতে জগতে।

———

উৎসর্গ

জর্জ বার্ণার্ড শ'র করকমলে··· ·

দিগন্ত পারের বন্ধু,

শাল-ফুলের মহুয়ার মতই তুমি ও আমি পরস্পরের কাছে রহস্যময়। আজকের এই যান্ত্রিক সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করেছ তুমি, তাই যান্ত্রিক নিষ্পেষণ থেকে বহুদূরে যে শাল-ফুল অকৃত্রিম আলো বাতাসে ভরে আছে তাই তোমাকে পাঠালাম।

ঝিরঝিরে বাতাসে যা দেখা দিলো, পূবালী বাতাসে যা আপনাকে প্রকাশ করলো, দখিণ বাতাসে যা মাতলো, বাদল বাতাসে যা ছড়িয়ে গেলো, উদাস বাতাসে যা ভেসে চলেছে তা তোমার।

রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক আমি, শাল বনের অন্তরালে আমার ক্ষুদ্র কুটীর কিন্তু সমুদ্র পারের গর্বিত সহরের বন্ধুকে জানবার আগ্রহও ত আমার কম নয়।

আমার নমস্কার

ইতি—

মানিকলাল সিংহ

At the hand of George Benard Shaw,
Comrade of the distant horizon,

We are mysterious to each other like 'Mohuya' the hero of the 'Shal-Ful.' You have cut the root of the machine civilization, that is why 'Shal-Ful' which blooms far away from the machine world is dedicated to you. The beautiful flower that comes out in the gentle breeze, that exposes itself in the east wind, that gets drunken in the south wind and that discatters and floats around in the ephemeral soft breeze is yours.

I am from Rabindranath's country and I have built my cottage behind the wild trees of the jungle but my eagerness to know the friend of the distant horizon separated by the boundless ocean of that proud city of Europe is no less intense. I bow to thee.

Yours.

M. Sinha,

ছোট একটি গ্রাম।

বন ঝাউ আর পরিচিত অপরিচিত লতাগুল্মে ঘেরা—দূরে সারি সারি অসংখ্য শাল গাছ। এই শাল-বনের মধ্যে চৈত্রের রোদ্দুর শান দেওয়া বাঁকা তলোয়ারের মতোই ঝক্ ঝক্ করছে। বাউরী বাতাস এসে দোলা দিচ্ছে শাল-ফুলের অসংখ্য স্তবকে। ওদের পরাগ আর ধূলো মিলে ফাগের গুঁড়োর মতো উড়ছে। মাঠের উপর একদল গরু চরছে—কেউ বা জাবর কাটছে, কেউ বা ঝিমুচ্ছে। কতকগুলি ছোট ছেলে গুলি-ডাণ্ডা খেলছে—'তুই নাকি সহরে যাচ্ছিস্ মহুয়া?' ওদের একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ বাবার ত তাই মত।' মহুয়ার চোখ হু'টো ছল্ ছল্ করে ওঠে···পড়াশুনোর জন্য ওকে সহরে যেতে হ'বে··· মাটির মমতা ওকে পেয়ে বসে···এই গাঁয়ের মাটির মমতা···যে মাটির সবুজে মটর শুটির বনে সরষে গাছের আব্ছা হলুদ মিশে স্থন্দর রঙের সৃষ্টি করেছে। ওর দৃষ্টি যায়···মাঠ পেরিয়ে, ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে খালবিলের তুধালী কলমীর বন পেরিয়ে···শাল-

বনের মধ্যে। চোখের জলে ঝাপ্সা দেখায় দূরের ঐ শাল-গাছ-গুলো।

ওকে বুকে চেপে ধরে চঞ্চল ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদে···

'আবার কখন আসবি রে?'

'কি জানি কখন সুযোগ হ'বে'—উদাসভাবে মহুয়া উত্তর দেয়।

বেলা পড়ে। ছেলেরা খেলা বন্ধ করে। আকাশের কিনারে সূর্য দিনের চিতা জ্বালায়···পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় দিনটা, ছাইএর মতো ফ্যাকাশে গোধূলি নামে মাটির বুকে। গোরুগুলো খুরের ধূলো উড়িয়ে চলে···বাড়ী ফিরে চলে ছেলের দল।

কয়লার মতো কালো রাত নামে···আগুনের ফুল্‌কীর মতো তারা ফোটে আকাশের গায়। ঝিঁঝিঁ ডাকে···রাতের স্তব্ধতাকে ভেঙে ভেঙে, টুক্‌রো টুক্‌রো করে করে···এলোমেলো চিন্তা আসে মহুয়ার মনে···আসন্ন বিদায়ের অবসাদকে ভেঙে চুরচুর্ করে দিয়ে। মহুয়ার মগজে উষ্ণ চিন্তার রাশগুলো সাপের মতো কিলকিল্ করে···"সহর কেমন তা?···কারা থাকে সেথায়?···স্কুলে কেন পড়তে হ'বে তাকে?···পড়াশুনো করে লাভ কি?···সেখানে গেলে 'ও' কি খেলার সাথী পাবে?···চাঁপা চঞ্চলের মতো বন্ধু পাবে?" উষ্ণ চিন্তা ফুটন্ত জলের মতো ঘোরাফেরা করে ওর চেতনায় আর অবচেতনায় ততক্ষণ যতক্ষণ না ঘুমের মধ্যে ঘুমিয়ে যায় এক এক করে দেহের ও মনের জাগ্রত অনুভূতিগুলি।

পরের দিন। রাতের কালি আলোর জলে ধোওয়া যায়, সোনালি রোদের ছোঁওয়ায় কুয়াসার পর্দা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়···পাখীদের কাকলীতে বনের ঘুম ভাঙে মৌমাছি আর ভ্রমরের গুন্‌গুনে ফুল জাগে···ধীরে ধীরে গ্রাম জাগে···মহুয়া জাগে।

গত সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে যাওয়া চিন্তাগুলো জেগে ওঠে···পাখীর মতো ডানা মেলে উড়ে চলে দূরে-দূরান্তরে···অজানার সন্ধানে ···গ্রাম ছাড়িয়ে, শালবন ছাড়িয়ে রূপলোকে মায়ালোকে অজানিত সহরের সন্ধানে সন্ধানে।

বন্ধুরা আসে। চঞ্চল, চাঁপা, মায়া, চাঁদা। আসন্ন বিদায়ের চিন্তায় ভারি ওদের মনগুলো, চোখেব জলে ভারি চোখের পাতাগুলো, চাপা দীর্ঘশ্বাসে ভারি বুকের ভিতরগুলো। মহুয়া ওদের ছেড়ে সহরে যাবে···কিন্তু ছেড়ে দিতে কি মন চায়··· গাঁয়ের ধুলো বালি ঝোপ ঝাড় কেউ চায় না মহুয়াকে ছেড়ে দিতে···ওকে ওরা ঘিরে রাখতে চায় রাতের কুহেলীব মতো, ঘুমের মতো, ডানার মতো। আসন্ন বিদায়ের শেষ-মুহূর্তগুলি মহুয়াদের দুয়ারে পৌঁছায়···বারণ মানে না, মায়ের চোখেব জলে ওদের পথ পিছল হয় না, বন্ধুদের কাতর চাউনিতে গতি মঞ্জুর হয় না।

খাওয়া দাওয়া শেষ হয়। মহুয়া আর ওর বাবা গাড়ীতে চেপে বসেন, মা দাঁড়িয়ে চোখ মোছেন,—অমঙ্গল চোখের জলকে মাটিতে পড়তে দেন না। মন্থর গতিতে গোরুর গাড়ী

চলে দূরে মহুয়ার বন্ধুরা দাঁড়িয়ে থাকে···ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে মহুয়ার গাড়ীর দিকে। শিবমন্দির—মনসাতলা—আট্‌চালা—পাঠশালা বাগান—জোড় পেরিয়ে গাড়ী বনের মধ্যে ঢোকে। মহুয়া চেয়ে থাকে পিছনে ফেলে আসা ওদের বাড়ী-ঘর, গাছপালা, মাঠ প্রান্তরের দিকে···ওর উদাস দৃষ্টি চলে যায় দূরে—পরিচিত সবুজ বুনো ঝোপের আশে পাশে···শেওলা জমা পদ্মদীঘির পদ্ম, শালুক আর কলমীর বনে···আরো দূরে যেখানে গাঁয়ের গোরু চরে জোড়ের ধারে ধারে···মখমলের মতো সবুজ ঘাসের মাঠের উপরে।

মহুয়ার মনে পড়ে গ্রামের দিনগুলি···চঞ্চল খেলার দিনগুলি মনে পড়ে বর্ষার দিনে কতবার ও গা এলিয়ে দিয়ে ঢলের মুখে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে—মনে পড়ে চাঁপা ও অন্য বন্ধুদের নিয়ে কতবার বালি আর কাঁকরের পাড় তৈরী করে—'নুকু নুকু ধাড়ি সরু চাল কাড়ি' খেলেছে। অবসাদ আর চিন্তায় ওর মন ভারাক্রান্ত হয় কিন্তু কতক্ষণের জন্যে? শালবনের মাঝ দিয়ে সংকীর্ণ সর্পিল পথের অচেনা লতাগুল্মগুলো কেড়ে নেয় ওর মনকে···সজাগ করে আকর্ষণ করে ওর উদাস চাউনিখানি—অফুরন্ত সবুজের গহনে ডুবে যায় তা—দূরে দৃষ্টি পড়ে যেখানে সবুজ শালের বন ঊর্ধ্বে মাথা তুলে আকাশের কিনারের নীলকে ছোঁয়। পুরাতনের পিছু ডাকা আর নূতনের হাতছানি বার-বার দোলা দেয় মহুয়ার মন খানাকে—দোলকের মতো দুল্‌তে থাকে ওটা আনন্দ আর

ব্যথা, আশা আর নিরাশা উত্তেজনা আর অবসাদের মধ্যে।

এক ঘেয়ে গোরুর গাড়ীর একটানা চলা—ধীর ও মন্থর তন্দ্রা জাগায় মহুয়ার মনে ও দেহে। দুপুরের নিষ্করুণ সূর্য তখন আলোর ঝালর বুনে চলে আকাশের গায়—ঝিক্‌মিক্ করে ওর প্রান্তগুলো সবুজ বনের গায়ে গায়ে। ঘুমিয়ে পড়ে মহুয়া—একে একে সব চিন্তাগুলো থেমে যায়।

ঘুম যখন ওর ভাঙলো তখন রাত নেমেছে আর তারি ডানায় ঢাকা পড়েছে আলোর সুন্দর হাসিখানি। অসংখ্য তারা জ্বল্‌ছে টুক্‌রো হীরের মতই—চাঁদ উঠতে দেরি আছে অনেকখানি··· ঝিঁঝিঁরা ডাকছে···আশেপাশে শেয়ালগুলোর নিঃশঙ্ক উল্লাস··· ভয় পায় মহুয়া, ভয়ে ওর বাবার পাশে গাড়ীতে চুপ করে বসে থাকে 'ও'। ধীর মন্থরগতিতে গাড়ী চলে। শাল-বন শেষ হয়ে ছোট ছোট গ্রামগুলির ভেতর দিয়ে গাড়ী চলে···ঘুমন্ত গাঁয়ের বুকের উপর দিয়ে চাকার চাপ আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ নিস্পন্দ গ্রামকে নাড়া দেয়। অস্ফুট নৈশ চীৎকার ভেসে আসে মৃদু স্বল্প অস্বস্তিখানি···আবার মিলিয়ে যায় সেই শব্দ—অঘোরে ঘুমোয় গ্রাম—গাড়ী চলে ছায়া আবছায়ার মাঝ দিয়ে।

রাস্তার পাশে গাছগুলো কালো কালো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কাল পেঁচার ডাকে অন্ধকার গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে ···যেন ওর চাপা অন্তর্বেদনাকে প্রকাশ করছে।

রাত বাড়ে। ধীরে ধীরে গাছের ফাঁক দিয়ে পাণ্ডুর চাঁদ ওঠে আকাশে···ওর স্নিগ্ধ আলো মোমের মতো গলে গলে পড়ে মাটিতে···ছায়া আবছায়ার মাঝখানে।

শেষ রাত্রির কাছাকাছি ওদের গাড়ী পৌঁছায় সহরে। চার দিকে ইটের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী···পীচ ঢালা বাঁধা রাস্তা··· কালো কালো দৈত্যের মতো কলকারখানার চিম্‌নিগুলো···মন্ত্র-মুগ্ধের মত মহুয়া দেখে··বিস্ময়াবিষ্ট হয়। আলোর পাখায় ভর দিয়ে দিন আসে। নিদ্রিত সহর জাগে···ওর বিরাট অজগরের মত দেহটায় আলোর তাপ লাগে···উগ্র কর্ম নেশায় মেতে ওঠে 'ও'···সেই নেশা উত্তেজনার সৃষ্টি করে ওর শিরা-উপশিরায় ধমনীতে ধমনীতে।

জেগে ওঠে অগণিত মানুষ···দলে দলে অগণিত মানুষ চলে কলকারখানায়, অফিসে, স্কুলে, কলেজে, রেঁস্তোরায়, আড়তে দোকানে, বাজারে···। কালো ধোঁওয়ায় আকাশ বাতাস ভরে যায়···দিনের আলো ধোঁওয়ায় মলিন হয় মহুয়ার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়···স্বচ্ছ আলো বাতাসের মধ্যে মানুষ হ'য়ে এই ধোঁওয়া আর ধূলিকণায় অস্বস্তি বোধ করে মহুয়া।

বেলা দশটার কাছাকাছি ওদের গাড়ী ওদের বাসার সামনে দাঁড়ায়। কোন কাতর চোখ ওদের প্রতীক্ষায় বসে নেই···কেউ এসে এদের ডেকে নিয়ে গেল না···একে একে সব ব্যবস্থাই ওদের করে নিতে হলো। দিন যায় অগণিত মানুষের মাঝখানে থেকেও মহুয়া রয়েছে নিতান্ত সঙ্গীহীন। অতীত চিন্তাগুলো

ওর মন খানাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। স্কুলে ভর্তি হয়েছে মহুয়া—কাঠের বেঞ্চে এক ঘেয়ে দশটা চারটে বসে থাকা··· প্রহরীর মত শিক্ষকদের যাতায়াত ওকে ব্যাকুল করে তোলে। স্কুল যেন একটা জেল···জীবনের সহজ আনন্দ বেত, শাসন আর লাল চোখের নীচে মুষ্‌ড়ে যায়।—

"তোমার নাম কি ভাই?" ওরই পাশের একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস্ করে মহুয়া।

'অমিত, চুপ কর মাষ্টার মশাই দেখ্‌তে পাবেন।'

চুপ করে মহুয়া। কাঠের বেঞ্চে এক ঘেয়ে বসে থাকতে কষ্ট হয় ওর। উস্ খুস্ করে—এদিক ওদিক তাকায়।

you, তোমার নাম কি? Be attentive বজ্রকণ্ঠে হাঁকেন মাষ্টার মশাই।

বসে বসেই কাঁদো কাঁদো ভাবেই উত্তর দেয়—'মহুয়া'।

"হুঁ মহুয়া, দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারোনি, দাঁড়া বেঞ্চের উপর" ঠাস্ করে একটা চড় কসে দেন মাষ্টার মশাই।

থতমত খায় মহুয়া। ওর চোখ বেয়ে বন্যার জল নামে অন্যদিকে ছেলেরা হেসে ওঠে।

"কাঁদ কেন? এটা কি মামাবাড়ী পেয়েছ? চোখের জল ফেল্লেই মনটা ভিজে যাবে?"

লজ্জায় দুঃখে ক্ষোভে মরতে ইচ্ছা হয় ওর। অনেক তর্জন গর্জন কান্নাকাটির মধ্যে ঘণ্টা শেষ হয়। যুগপৎ বৈশাখীর কালো ঝড়, আষাঢ়ের গুরু গুরু শ্রাবণের বর্ষণ। মাষ্টার মশাই চলে

গেলেন—মাঝে ২।৩ মিনিটের মত ছেলেরা মেতে ওঠে—চেঁচা-মেচি, ঠেলাঠেলি মারামারিতে গরম হয়ে ওঠে ক্লাস রুম। অপর একজন মাষ্টার মশাই এলেন।

"কি পড়া আছে তোমাদের?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'জ্যামিতি স্যার'—সমস্বরে অনেকগুলো ছেলে বলে উঠ্লো। "সবাই পড়া তৈরী করে এসেচ?"—সমস্ত ক্লাস চুপ্ কোন সাড়া শব্দ করে না ছেলেরা।

"কৈ দেখি এসো ত খোকা বোর্ডের কাছে"—অমিতের পাশের ছেলেকে ডাকলেন মাষ্টার মশাই।—"চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ যে এসো এসো বোর্ডের কাছে।"

"বেশ বুঝিনি স্যার"—কাঁচু মাচু ভাবে বল্লে ছেলেটি।

"দাঁড়াও বেঞ্চের উপর"—আদেশ করলেন মাষ্টার মশাই।

পিছনের বেঞ্চে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্লো একজন ছেলে।

"কিহে মজা মারতে এসেচো, এসো দেখি kneel down দিবে এসো"—কর্কশ ভাবে আদেশ করলেন মাষ্টার মশাই।

"স্যার আর **কর্বোনি**" কাঁদো কাঁদো ভাবে ছেলেটি বল্লে।

"যাও আর **করোনি**"।

অমিতের পাশের ছেলেটি ততক্ষণ লক্ষ্মী ছেলের মত বেঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

"কি অমিত, তুমি পার?" অমিতকে ডাকলেন তিনি।

বেশ পারিনি স্যার"—মুখ নামায় অমিত

"তুমি পার খোকা? নূতন মুখ দেখ্‌ছি যে, কবে ভর্তি হয়েচো?" মহুয়াকে লক্ষ্য করে মাষ্টার মশাই বল্লেন।

'আজকে স্যার'—সলজ্জভাবে মহুয়া উত্তর দেয়।

'আচ্ছা বসো, দিন পড়া করে এনো কিন্তু।' তোমরা কি করছো বাবুরা?—পিছনের বেঞ্চ লক্ষ্য করে বল্লেন তিনি।

নীরবে মাথা নীচু করে ছেলে দু'টি।

'Oh wordmaking খেল্‌ছো?' "তা-বেশ আমি এদিকে চেঁচিয়ে মরি আর তোমরা মনের সুখে খেলা কর!" চুনের মত ফ্যাকাসে হ'য়ে যায় ছেলেদের মুখ। ঘণ্টা বাজ্‌লো মাষ্টার মশাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। এটা টিফিনের ঘণ্টা ছেলেরা সারি সারি দাঁড়ায় খাবারের বাটিগুলোর সামনে মন্ত্র-মুগ্ধের মত মহুয়া তুলে নেয় খাবারের একটি বাটি…নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে আরো আস্তে মেঝেতে বাটিটি নামিয়ে রাখে। যন্ত্র-চালিতের মত ছেলেরা ফিরে যায় ক্লাস রুমে। ঘণ্টা বাজ্‌লো আবার একজন মাষ্টার মশাই এলেন ক্লাসে। ইনি একটু বেশী প্রবীণ গম্ভীর প্রকৃতির লোক, স্তব্ধ ক্লাস কোন গোলমাল নেই… ছেলেরা পড়া বলে চলে, ঘণ্টা শেষ হয়।

আবার ঘণ্টা বাজ্‌লো…একজন মাষ্টার মশাই বেরিয়ে যান আর একজন আসেন। ক্লাস শেষ হয়।

ছুটির ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং ঢং।

ছেলেরা হুল্লোড়ে মেতে বেরিয়ে যায়। ফাঁকা মাঠের উপর

দিয়ে বর্ষার বাঁধ-ভাঙা জলের মতো—উড়ন্ত বুনো-পাখীর ঝাঁকের মতো সশব্দে দলে দলে।

একজন ছেলে মহুয়ার পিছনে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বল্‌ছে। '—তোমার নাম মহুয়া?' অমিত মহুয়ার একটা হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করে।

'হুঁ।' উত্তর দেয় মহুয়া।

'কোথেকে আস্‌চ তুমি?'

'কল্যাণপুর থেকে।'

'কোথায়, কোন্‌ দিকে তা?'

'ছুই দিকে—অনেক দূর গোরুর গাড়ীতে যেতে হয়।'

আমাদের বাড়ী যাবে? চল না,—জেদ করে অমিত।

সলজ্জ মহুয়া মুখ নীচু করে।

'চল যেতেই হ'বে, না গেলে ছাড়চিনে।'

অমিত মহুয়াকে টেনে টেনে নিয়ে যায় আর যন্ত্রের মত মহুয়া ওর পিছু পিছু যায়।

"এই যে এসে পড়েছি, এই আমাদের বাড়ী। মীনাদি, মীনাদি দেখ্‌বে এসো মহুয়া এসেছে···আমার নূতন বন্ধু মহুয়া।"

—"কে রে? কাকে বল্‌ছিস্‌?"—ঘরের ভেতর থেকে প্রশ্ন করলো মীনাদি।

"আরে বেরিয়ে দেখো না, আমার ক্লাসমেট্‌ মহুয়া, আমার নূতন বন্ধু মহুয়া।"

বের হ'য়ে আসে ওদের চেয়ে বয়সে বড় একটি মেয়ে। সুন্দর ওর মুখশ্রী···তবে অনেকটা পুরুষের ধাঁচের···ওর খাড়া নাক, পুরু ঠোঁট, চ্যাপ্টা মুখের গড়নে পাওয়া যায় একটি পাহাড়ী ফুলের পরিচয়। মহুয়াকে পাশে টেনে নিয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে—"কি নাম তোর ভাই?"

'মহুয়া বর্মণ'—সলজ্জ মহুয়া উত্তর দেয়।

'বাঃ বেশ নামটি ত, বেশ, বেশ তাহ'লে রোজ আসিস্ আমাদের বাড়ী, আমরা তিনজনে বসে খেল্‌বো, গল্প করবো। এই সামান্য পরিচয়ের মধ্যে অমিত আর মহুয়ার ভাব হ'য়ে যায়। অমিতের মাও এলেন—মহুয়াকে কোলে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন বাঃ, বেশ ছেলেটি ত তবে খুব লাজুক বড্ড পাড়া-গেঁয়ে···। মা এদের জন্য চা জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন। তা খেয়ে অমিত আর মহুয়া খেল্‌তে চলে গেল। দিন যায়। দিনে দিনে অভ্যস্ত হয় মহুয়ার এই নাগরিক জীবন। মহুয়া, অমিত আর মীনাদি বেড়াতে বের হ'য়েচে। ফাগুনের উতল হাওয়া কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চলেছে—দূরে দূরে ডাকছে পরিচিত কোকিলগুলো—ভেসে আস্‌চে সেই চির পরিচিত মিষ্টি সুর কু—হু—কু—হু—।

মহুয়ার অবচেতন মনের একটি বন্য শিশু জেগে ওঠে—কোকিলটাকে ব্যঙ্গ করে ও একবার ডেকে ওঠে কু—হু। পীচ ঢালা বাঁধা রাস্তা। বহু লোক চলেছে এর বুকের ওপর দিয়ে। ওদের কলরব বাতাসে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে। 'চাই বাদাম-

ভাজা তাজা তাজা'—একটা দশ বার বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে হাঁক্‌ছে। —'চার পয়সার বাদাম দাও ত?' ওরা এর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

ছেলেটি ওজন করে বাদামগুলো তুলে দেয় এদের হাতে। নেবার সময় হু'টো পড়ে যায় মাটিতে।···একটা বুড়ী মেয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল তুলে নেয় সেই পড়ে যাওয়া বাদাম হু'টো। তাড়াতাড়ি মুখে ফেলে দেয় পাছে কেউ দেখে ফেলে।

মহুয়া, অমিত, মীনাদি পথ চলে ওদের পাশ দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে জিপ্‌ গাড়ীগুলো ছুটে চলে যায় রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে যায়···ওরা বাজারে এসে পড়ে। অসংখ্য মানুষের কণ্ঠস্বরের অর্কেষ্ট্রা বেজে ওঠে···ব্যক্তির কথা জনতার আবর্তে তলিয়ে যেতে চায় হু'একটা বুদ্‌বুদের মতই ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে যায়।

"আজ মাছের সের তিন টাকা।"

"উঃ কি গরম রে বাবা।"

"আর বাজার কর্তে হ'বে না শালারা যেন চড়াচ্চে, ক্রমশঃ জিনিষের দাম আগুন হ'য়ে পড়্‌ছে।"

"একটা বিড়ি দাও না মাইরী"—

"মেছুনীদের বাড় দেখ্‌না!"

'আলুর সের চৌদ্দ আনা' চৌদ্দ আনা···একজন দোকানদার জোরে জোরে হাঁকছে···চিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওর কণ্ঠস্বর সকলের কানে গিয়ে বিঁধছে।

"বাঃ, বৌভাতে খাওয়ালে কৈ হে ?"

"চুন কেনা হয় নি ত !"

"আধ সের টমেটো দাও ত ?"

পথ চলে ওরা। বাজার পেরিয়ে সহর ছাড়িয়ে গাঁয়ের মেঠো রাস্তায় নামে ওরা। বুনো পাখীগুলো আকাশ পথে উড়ে চলেছে। শঙ্কচিলগুলো ভাঁউরী দিচ্ছে আর মধুর স্বরে ডাকছে, আমের বোলের পাশে হ'চ্ছে মৌমাছিদের গুঞ্জরণ আর হ'চ্ছে ভ্রমরের মৃদু আলাপ ও ঝঙ্কার।

পথ চলে ওরা। পথের পাশে দু'চারটে মাতাল টল্‌তে টল্‌তে চলেছে ওদের অসংলগ্ন কথা বলতে বলতে। দু'একটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নালার উপর। সারাদিনের কাজের পর এক চোট তাড়ি খেয়ে বাড়ী ফিরছে ওরা। ওদের একটা বমি করেছে কতকগুলো মাছি বসেছে ওর মুখে আর গায়ে একটা কুকুর ওর মুখ শুঁকছে।

বাতাসে ভেসে আসে পচানো ভাতের বাসি টক্ গন্ধ নাকে রুমাল ঢাকা দেয় মীনাদি, জোরে জোরে পথ চলে ওকে পেরিয়ে যাবার জন্যে। কিছুদূরেই একটা ফাঁকা জায়গা বটগাছের ছায়ার নীচে মখমলের মত নরম সবুজ কচি ঘাস। ওরা বসে পড়লো সেখানে।

সন্ধ্যা হয়। চাঁদ ওঠে আকাশের গায়। ধীরে ধীরে গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে ওঠে নবমীর উজ্জ্বল চাঁদ······মলয়ের ঠাণ্ডা

বাতাসে আরো স্নিগ্ধ হ'য়ে ঠাণ্ডা সে আলো রূপালী ঝর্ণার মত উপ্‌ছে পড়ে আকাশের পাত্র বেয়ে।

মহুয়া মীনাদির একটা হাত চেপে ধরে—"একটা গল্প বলো না মীনাদি"—আবেগের সঙ্গে অনুরোধ করে মহুয়া।

"কিসের গল্প রে ?" আবেগবিষ্টা মীনা প্রশ্ন করে

—"যা হোক্ একটা কিছুর—ভূতের, চোরের, বাঘের যা হোক্ একটা।"

এলোমেলো বাতাস বয়। কোঁকড়া চুলের রাশভরা মহুয়ার মাথাটা মীনাদি রাখে কোলের উপর, চেপে ধরে বুকের নীচের নরম জায়গাটাতে—উষ্ণতপ্ত কৈশোরের কমল কোরকের উপাদান দু'টোতে,—উদাস হাওয়া মহুয়ার চুলের রাশ উড়িয়ে মুখের ওপর ফেলে আঙ্গুল দিয়ে সরিয়ে দেয় মীনাদি সেগুলোকে—মীনাদির আদরের নীচে মহুয়া বিলিয়ে দেয় নিজেকে।

দিন যায়।

বড় হয় মহুয়া আর অমিত, মীনাদি আরো একটু বেশী বড়। জীবনের প্রবাহ ভিন্ন খাতে বইতে সুরু করে। মীনাদির জীবনে লাগে যৌবনের মলয় স্পর্শ···অজানা আবেগে শির্ শির্ করে ওর দেহ মন···আবেগের অনুভূতি দেহের ক্ষেতকে ছাপিয়ে ওঠে ···পলি জমে কুমারী বুকের ব-দ্বীপে নরম সোনা-ক্ষেতে ফুল ফোটে, যৌবনের ফুল উগ্র ও মাতাল। মহুয়া আর অমিতকে পেয়ে বসে স্বপ্ন। অপূর্ব মধুময় রঙিন স্বপ্ন—ভেবে পায় না কি তারা হতে চায়, কি তারা পেতে চায়। জগতের আরো দশজন

কিশোরের মতই মনের অশান্ত আবেগগুলো ডানা মেলে পাড়ি দিতে চায় রূপলোকে, মায়ালোকে।

ছোট খাটো দুঃসাহসের হাতছানিতে ভেসে চলে ওরা, সাহেব বাগানের ফুল, মাড়োয়ারী বাগানের আনারস চুরি করে ওরা। এই চুরি কোন সঙ্কোচ আনে না ওদের মনে।···মাইল দেড় দু'ই লম্বা একটা বিল রাতের অন্ধকারে পার হয় ওরা—নীল-জলের উপর অন্ধকারের ছায়া পড়ে—তরল আলকাৎরার মতো দেখায়। দূরে হুড়াস্ করে একটা শব্দ হয়। মহুয়া অমিতকে ডাকে—'অমিত।' 'চুপ্ আস্তে কেউ টের পাবে।' দূর বিস্তৃত বিলে কে কোথায় কার টের পায়। কালো মিশ্‌মিশে জলের উপর ভেসে চলে ওরা।—

"মহুয়া তোর ভয় করে?" অমিত প্রশ্ন করলো।

"না।"

"তবে ডাকিস্ কেন?"

"কিছু না, ঐ জোর শব্দটা কিসের?"

"বোধ হয়, বড় মাছ টাছ হবে।"

"না।"

"তবে কিসের?"

"তুই কি জানিস্ নে এই বাঁধে কুমীর আছে বলে?"

অমিত মহুয়ার কাছে আসে—নীচের কালো জলের দিকে তাকায়, ছায়া পর্যন্ত নেই—মনে হয় নীচে অসংখ্য বুনো মোষদল বেঁধে রয়েছে। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে অমিতের।

"কুমীর, কি কুমীর মহুয়া ?" প্রশ্ন করে অমিত।

"বোধ হয় মাছ-কুমীর।"

ওঃ তাই, স্বস্তির নিশ্বাস অমিতের বুক থেকে বের হ'য়ে আসে। পাশাপাশি সাঁতার দেয় ওরা। দূরে মিট্‌মিট করে জ্বলে মাড়োয়ারী বাগানের আলো। মনে মনে হাসে মহুয়া আর অমিত।

আকাশে তারা জ্বল্‌ছে—ঝিক্‌মিক্ করে চকমকির আলোর মতো, অন্ধকার জলের বুকের ভেতর। ওরা এসে পড়ে, ভিজে তুলোর মতো নরম মাটিকে ছোঁয় পা দিয়ে, পাড়ে ওঠে—বাঁশ আর কাঁটা তারের বেড়া পেরিয়ে আনারস ঝোপের মধ্যে যায় ওরা। অন্ধকারে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে দেখে—কিল্‌কিল্ করে সরে যায় একটা সাপ—আঁৎকে ওঠে মহুয়া। কাঁটা ফোটে অমিতের পায়, টেনে বের করে—গোটা কতক আনারস হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে ছিঁড়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে অগাধ অথৈ কালো জলে। এমনি দিন যায় পালহীন ছোট্ট নৌকার মতো, ধাবন্ত পাখীর সশব্দ ডানার মতো।

একদিন সন্ধ্যার পূর্বে ওরা ঢোকে সাহেব বাগানে ফুলচুরি করতে কিন্তু মালী পূর্বে থেকেই সতর্ক ছিল—ওদের তেড়ে এলো আর মুহূর্তে ধরে ফেল্‌লো ওর ভাইসের মত শক্ত হাতের মুঠোর মধ্যে ওদের দুজনকে। অমিত আর মহুয়া ধস্তাধস্তি করলো অনেক কিন্তু পেরে উঠ্‌লোনি—মালী ওদের ছেঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে চল্‌লো সাহেবের সামনে। ভয়ে লজ্জায় এতটুকু হ'য়ে

পড়েছে ওরা। ঠিক সেই সময় একটি শ্যামবর্ণ ছিপ্ছিপে ছেলে এসে মালীকে বল্লে—"ওদের ছেড়ে দে বল্ছি নইলে লাথি মেরে বেটার ভুঁড়ি ফাটিয়ে দেবো।"

মালী এদের ছেড়ে দিয়ে বাঘের মতো ছো-মেরে লাফিয়ে পড়লো ওর উপর—প্রথমে মহুয়া আর অমিত হতভম্ব হ'য়ে পড়ে কিন্তু একটু পরেই ওরাও ঝাঁপিয়ে পড়লো মালীর উপর। তিনজনের সমবেত চেষ্টায় ব্যাটা বেশ একটু কাৎ হ'য়ে পড়েছে আর চীৎকার করেছে—ডাকু শালারা, চোর গুণ্ডা শালারা আমাকে খুন করলো···ইতিমধ্যে ওকে চীৎকরে শুইয়ে দিয়ে ওরা তিনজনে পাড়ি দিয়েছে। প্রায় আধ ঘণ্টা দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান শূন্যের মতো ওরা ছুটে চল্লো তার পরে দূরে একটা বট গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো—মিনিট পনের পরে ওরা সুস্থির হ'লো। "কোথায় থাকিস্ তোরা?" ছেলেটি প্রশ্ন করলো এদের। "এই সহরেই—চক বাজারের পাশেই আমাদের বাড়ী···আজ আপনি—আমাদের যে উপকারটুকু—করলেন—যে দারুণ অপমানের হাত থেকে বাঁচালেন" আবেগে মহুয়ার কথাগুলো কণ্ঠের মধ্যে আট্কা পড়ে। "আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো; কি ব'লে ডাকবো আপনাকে দাদা? মহুয়া কৃতজ্ঞতায় সঙ্কুচিত হ'য়ে বলে। "দেবীদা বলে;" "কেমন মনে থাকবে? সহজভাবে ছেলেটি বল্লে। "হুঁ" কৃতজ্ঞতার সম্মতি জানায় মহুয়া আর অমিত ওদের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক্ করে দেবীদা চলে গেলেন আর

ওরা ফিরে এলো ওদের বাসায়। আসার সময় দেবীদা বল্লেন "কাল কিন্তু আসিস্ ভাই, গল্প করা যাবে।"

গল্পের নেশায় মহুয়া আর অমিতের বুকটা আনন্দে ভ'রে যায়। ঘরে ফিরে গিয়েও' ওরা ভাবছে দেবীদার কথা, বাঃ বেশ এই দেবীদা আজকে বিপদের কথা মনে করে বুকটা ঘনঘন কাঁপে দেবীদা ভাগ্যিস্ ছিলেন নইলে কি অপমানটাই না হোত। একটা অজানা সম্ভ্রমে ওদের মন দেবীদার উপর আকৃষ্ট হয়—এই দেবীদা, কত সাহসী এই দেবীদা।

পরের দিন বিকেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহুয়া আর অমিত বেড়াতে বের হ'য়েছে দেবীদার খোঁজে কালকের বট গাছটার তলায় ওরা এসে দেবীদার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। অবেলার রোদ যখন নিভে এসেছে তখন দেবীদা এলেন। হ্যাণ্ডসেক করেই গল্প আরম্ভ করলেন। দেবীদা সহজভাবে আরম্ভ করেন—"দেখ্, সাহেবদের হাতে আমাদের কত লাঞ্ছনা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ওরা এসেছে আমাদের দেশে আমাদেরি বুকে বসে আমাদেরি শাসাচ্ছে। আমাদেরি দেশে বাগান করেছে আর সুখে আছে আর উল্টে আমাদেরি চোখ রাঙাচ্ছে।

মহুয়া আর অমিত আনন্দ পায় এই কথাগুলোতে।

একটু থেমে দেবীদা আবার বলেন আর এই যে জমিদার-গোষ্ঠী রয়েছে, যারা শুধু পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছে আর ভোগ করছে, আর ঐ দিকে চাষী বেচারারা বুকের রক্ত জল

করে শস্য উৎপাদন করছে অথচ এক মুঠো খেতে পায় না তারা।

মহুয়া আর অমিত উত্তেজিত হয়, ভাবে সত্যই ত। মনের ভিতরকার পাগলা ঘোড়ার মত ক্ষ্যাপা ভাবনাগুলো টগবগিয়ে ওঠে···দেবীদা বুঝতে পারেন ওদের এই দুর্বলতা, জোরে জোরে আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথের দু'লাইন কবিতা "অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।" আবার নিজেই বিজ্ঞের মতো জিজ্ঞেস করেন "এর অর্থ কি জানিস্?" এর অর্থ হচ্ছে অন্যায় যে করে এবং অন্যায় যে সহ্য করে উভয়েই সমান অপরাধী ভগবান এদের কাকেউ ক্ষমা করেন না।

"কিন্তু কি করতে পারি আমরা?" প্রশ্ন করলো মহুয়া। "করতে পারি না কি তাই বল?" উত্তেজিত দেবীদার চোখ দু'টো আবেগে জ্বল জ্বল করে ওঠে। "আমাদেরি পথ দেখাতে হবেরে, অমিতের পিট চাপড়ায় দেবীদা। অত্যাচারীর হাত থেকে দুর্বলকে বাঁচাতে হবে।" অমিত আর মহুয়া বোঝে দেবীদার কথাগুলো এলোমেলো ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ কিন্তু তবুও তা সত্য। পথ হয়ত জানেনি দেবীদা কিন্তু অন্তরের এই তীব্র অনুভূতিকে অস্বীকার করার মতো ক্ষমতা নেই ওদের।

দেবীদা আবার সুরু করেন "এই যে স্কুল কলেজের শিক্ষা ওতে আমাদের সত্য সত্যই মানুষের মতো মানুষ করে তুলছে কি? অফুরন্ত জীবনের আবেগ নিয়ে আমরা স্কুলে ঢুকি

যেদিন যাই সেদিন নিয়ে যাই একটা সবল স্বাধীন আত্মাকে· একটা স্পন্দনময় প্রাণকে কিন্তু যেদিন বের হই যে দিন পাঠ শেষ হয় সেদিন হ'য়ে পড়ি অনেকখানি যান্ত্রিক আর নিষ্প্রাণ দেহ, মন, চলন, বলন সমস্তই চল্‌তে থাকে বাঁধা নিয়মের আবর্তে শৃঙ্খল আর শৃঙ্খলার মধ্যে।" "কিন্তু শৃঙ্খলা না থাকলে চলবে কেমন করে?"

প্রশ্ন করলো অমিত। 'যেমন করেই চলুক তা যে আমাদের তেমন কাজে লাগবে না, কাজে লাগবে শুধু তাদের যারা আমাদের কাজে লাগায়—আমাদের হাজার দুর্বলতার খোঁজ রাখে যারা তারাই এর সুযোগ নেয়'। ব্যাকুলভাবে দেবীদা উত্তরের আশা করেন।

"কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণের, এর থেকে মুক্তির পথই বা কি? এই নিষ্পেষণ থেকে মানুষকে বাঁচাবেই বা কে, কে দেবে এত মানুষের মুক্তি?" প্রশ্ন করে মহুয়া।

"কেন মানুষের মুক্তি মানুষেই আন্‌বে একদিন। এই আমাদেরি কাজে লাগতে হ'বে আমাদের কাজ হ'বে স্বাধীনতা লাভ করা, যেখানে কারো লাল চোখের নীচে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয় না সত্যিকারের মানুষটি আজো অন্ধ সংস্কার আর বাধা নিষেধের মধ্যে সম্পুর্ণ চাপা পড়ে যায়নি।" দেবীদা থামলেন "কিন্তু দেবীদা, আমরা তা কি ভাবে কর্বো? এত মানুষের এত দিনের ভুল কি করে কাট্‌বে, কেমন করে বোঝাবো এদের? অমিত জিজ্ঞেস করলো দেবীদাকে। মন থাকলেই সব হয়।

সাধনা দিয়েই মানুষ সব করেছে সাধনা দিয়েই মানুষ দেবতার উপরে উঠেছে। মানুষকে বাঁচাতে হ'লে চাই সত্যিকারের শিক্ষা যা তাকে মুষড়ে দেবে না। স্কুল কলেজের শিক্ষায় যে সব মানুষ গড়া হচ্ছে তারা রাষ্ট্র ও সমাজ যন্ত্রের এক একটি অংশ মাত্র স্বাধীন চিন্তার অবকাশ স্বাধীন বাঁচার অধিকার তারা বড় একটা পায় না হাতও নাই কিছু করবার উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দেবীদার চোখ দুটো।

মহুয়া আর অমিত স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। স্বপ্ন রাজ্যের খবর পেয়েছে তারা—কিছু দিন থেকেই এমনি একটা কিছুরই সন্ধান করছিল তাদের কিশোর মন দুটো।

দেবীদা আবার সুরু করলেন—কতকগুলো বিশেষ নিয়মের নিগড় তৈরী হ'য়ে আছে আমাদের চারদিকে এদের থেকে যেন মানুষের পরিত্রাণ নেই। কোন দেশেই আজো এমন শিক্ষা চল্‌ছে না যা সত্যই মানুষকে মর্যাদা দিয়েছে। মানুষকে যারা শুধু নীতি আর আইন দিয়ে বাঁধলো তারা শুধু মানুষকে অপচয়ের মধ্যে নিঃশেষ করেনি, হত্যা করেছে পৃথিবীর প্রতিটি জীবজন্তুকে।

মন কি চায় স্কুল-কলেজের সমাজের গণ্ডীতে বাঁধা পড়তে? মন চায় একটা অবাধ উন্মুক্ততা—ঝর্ণার ধারে, বনের পাখীর ডাকে, বাতাসের দোলায় তা সায় দেয়—তা চায় না কাঠের বেঞ্চে বসে জীবনের আধখানা বেত আর শাসন আর বাকী আধখানা দারিদ্রে জর্জরিত হ'তে। দারিদ্র ও দুঃখের শত-সহস্র দংশনে আহত হতে। কেরাণী হ'য়ে কোন রকমে দুমুঠো

খেয়ে বেঁচে থাকতে।” মহুয়া আর অমিত আবিষ্ট হয়ে শোনে···
উদাসভাবে চিন্তা করে দেবীদার কথাগুলো—মানুষের কথা.
সমাজের বাধা নিষেধ, আইন নিয়ম শৃঙ্খলার কথা। পশ্চিমা
বুনো বাতাসে সামনের ঝরা পাতাগুলো ঘুরতে ঘুরতে উপরে
ওঠে। একটা দাঁড়কাক একটা চিলের পিছনে পিছনে উড়ে চলে—
কা-কা-কা-খা-খা—চমকে ওঠে . মহুয়া আর অমিত। বেলা
পড়ে গেছে—রাতের কালো পর্দাখানাকে কে যেন দিনের গায়ে
ধীরে ধীরে নামিয়ে দিয়েছে। আর দেরি করা চলে না দেবীদাকে
নমস্কার করে ওরা বাড়ী ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

‘আবার আসিস্ কিন্তু’—মিনতিভরা সুরে দেবীদা অনুরোধ
করলেন।

‘হাঁ নিশ্চয়ই আস্‌বো’—বলে মহুয়া ও অমিত বাড়ী ফিরে
যায়। পরের দিন ওরা আসে, ঠিক সেই জায়গায় অপেক্ষা
করতে থাকে দেবীদার জন্যে। দূর থেকে ভেসে আসে ঘুঘুর
ডাক—উদাস ও করুণ সন্ধ্যার কাছাকাছি দেবীদা এলেন এবং
আদেশের সুরে বল্লেন—আজ কিন্তু তোদের ঘরে ফিরে যেতে
বেশ একটু দেরি হবে। বাড়ীর শাস্তি আর ধমক তোমাদের
মাথা পেতে নিতে হবে কিন্তু বিচলিত হ’লে চলবে না।
এইত তোদের প্রথম পরীক্ষা—বাড়ীঘর, বাপ মায়ের মায়া
কাটাতে হ’বে দেশের কাজে নিজেদের তুচ্ছ জীবন বলি দিতে
হ’বে······এই যে এত কোটি মানুষ হাহাকার করছে···এদের
পরিত্রাণের পথ বের করতে হ’বে। দেবীদা থামে।

অমিত বলে—"কিন্তু দেবীদা, আমাদের মতো দু'একটা ছেলে মিলে কিই বা করতে পারি—আমাদের কি আছে যা নিয়ে আমরা এই বিরাট সংগ্রাম সুরু করতে পারি? মানুষের এত দিনের ভুল যা আমাদের হাড়ে হাড়ে মিশে আছে তা থেকে তাদের মুক্তি কেমন করে আন্‌বে আমরা?" উত্তেজনায় দেবীদার চোখ দু'টো জ্বলে ওঠে, মুখে ফোটে ওঠে দৃঢ়তার একটা দীপ্তি জোর গলায় দেবীদা বলেন—"ওরে মন থাকলেই সব পাবা যায়, দুর্বার আগ্রহ নিয়ে যুগে যুগে মানুষ যা কবতে চেয়েছে তাই করেছে। সাধনা দিয়ে মানুষ দেবতার চেয়ে বড় হয়েছে। দেবত্বে সীমা আছে……কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বে সীমা নেই…… একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড় না হয় মরবি তোর আমার মতো বহু লোক হ'চ্ছে আর মরছে তাতে জগতের কিই বা আসে যায়। বরং কীটের মতই আগুনে ঝাঁপ দিয়েই মরবি তবু চল নির্ভীকভাবে আলোর সন্ধানে।" "তা না হয় গেলাম কিন্তু কাজই যদি না সিদ্ধ হ'লো তবে গিয়েই বা ফল কি? প্রশ্ন করলো অমিত।

খড়ের স্তূপে পড়া আগুনের মতই দপ্ করে জ্বলে উঠলেন দেবীদা —"ফল আছে বই কি। বহু দিনের গ্লানি এক দিনে অপসারিত হ'বে না যুগ যুগ ধরে আমাদেরও সাধনা করতে হ'বে তবেই তা সার্থক হ'বে। মানুষের যেখানে অশিক্ষা, দৈন্য, অভাব সেইখানেই আমাদের কাজ খুঁজে বের করতে হবে সত্যিকারের ত্রুটি কোথায় তা হ'লেই সংশোধনের উপায়ও

মিল্‌বে ; ক্লিষ্ট, অপমানিত, নির্যাতিত মানুষকে ডেকে তুলতে হবে। তারা জাগবে পৃথিবীর বুকে সুন্দর দিনের প্রতিষ্ঠা হ'বে।" উত্তরের আশায় দেবীদা মহুয়া আর অমিতের মুখের দিকে তাকান।

"কিন্তু দেবীদা এর জন্য যে অর্থ, যে সামর্থ্য সংস্থানের প্রয়োজন তা কি করে পাব আমরা ?" মহুয়া জিজ্ঞেস করলো।

হেসে দেবীদা বলেন—"কেন শুধু চেষ্টায়, মন নিয়ে নেমে যা চুরি, ডাকাতি, লুট যা করে হোক্ পেতে হ'বে আমাদের এই সব······আনন্দমঠের সন্তানদের কথা মনে কর, তাদের পথই আমাদের পথ।"

"কিন্তু দেবীদা চুরি-ডাকাতি-লুটের মধ্যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা হ'বে কেমন করে ?" গান্ধীজীর দেখানো পথ থেকে আমরা যে তাহ'লে বিচ্যুত হ'ব, একটা মস্ত ভুল কর্বো তা হ'লে ?"—এক সঙ্গে প্রশ্ন করলো মহুয়া আর অমিত।

"ভুল ঠিক হ'বে না। গান্ধীজী, জহরলাল, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লুকিয়ে আছে দেবত্ব কিন্তু শুধু দেবত্ব নিয়েই একটা গোটা দেশ গড়ে না। ভালো করে গড়ে তোলার জন্য নির্মমভাবে যে ভাঙার প্রয়োজন তা তাঁদের ধাতে সইবে না। যুধিষ্ঠিরকে চাই তাঁকে নিয়েই ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হ'বে কিন্তু দুঃশাসনের শাসনের জন্য ভীমকেও চাই······শুধু আদর্শ দেশ-প্রেমিকই দেশ গড়তে পার্বে না—নির্ভীক সৈনিকেরও প্রয়োজন আছে—অন্ধ খুন মাতাল সৈনিক।

দেবত্বের আয়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে—দেবত্বের সঙ্গে পশুত্বের সংযোগ চাই দেবত্ব মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ কিন্তু পশুত্ব 'Life force' দেবত্ব মানুষের জীবনের ফোটা ফুল কিন্তু ফুলকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মূলের প্রয়োজন আছে ······যে মূল অন্ধকার মাটিতে ডুবার শক্তি নিয়ে মাটিকে শোষণ করছে তাই সঞ্জীবিত করে রেখেছে মনুষ্যত্বের গাছকে··· মূলের প্রয়োজনকে বাদ দেওয়া চলবে না···অন্ধকার মাটির বুকে মূল করেছে ফুলের সাধনা···তাই ফুল যখন ফোটে দিগন্ত তখন আলোয় ঝলমল করে······তাই নূতন সৃষ্টি গড়বে পশুশক্তি দেবশক্তির সমন্বয়ে···পশুত্ব যেদিন দেবত্বের সাধনা কর্বে সেদিন মনুষ্যত্ব জাগবে পরিপূর্ণভাবে।" বিশ্বাসের দৃঢ়তায় দেবীদার মুখখানা উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

রাতের কালো তখন আকাশ বাতাসকে আচ্ছন্ন করেছে··· মহুয়া আর অমিতের অন্তরেও এই একই অন্ধকারের প্লাবন বয়ে চলেছে। পূর্ব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কোথায় মিলিয়ে গেছে আবার দেবীদার কাছ থেকে যা তারা আজ পেলো তাও অন্ধকার কুহেলিকাচ্ছন্ন কালো আকাশে যে তারাগুলো ক্ষীণ আলো নিয়ে দীপ্তি পাচ্ছে তাদেরি মতো অস্পষ্ট। ক্ষীণ আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো মনের অন্ধকার আকাশে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে মিট্-মিট্ করছে। অনেক রাতে মহুয়া আর অমিত বাড়ী ফিরে গেল। পরের দিন স্কুলের ছুটির পর ওরা বের হয় দেবীদার খোঁজে সেই পুরানো বটগাছের তলাতেই দেবীদার দেখা মিল্‌লো।

"আজ আর গল্প করে লাভ নেই—তার চেয়ে বরং বেড়াতে যাই চল''—দেবীদা বল্লেন।

কোন আপত্তি না করেই অমিত আর মহুয়া উঠে বসে ঝোপঝাড় পার হ'য়ে ওরা চল্‌তে থাকে—একটু পরেই পার হয় একটা খাল—বুনো ফুলের ঝাপসা গন্ধ ভেসে আসে বাতাসে—অবেলার লাল্‌চে রোদ ক্রমে ফ্যাকাশে হ'য়। উঁচু খাড়া কাঁকরের পাড়—ওরা পা টিপে টিপে চলতে থাকে। একটু অসাবধান হ'লেই ব্যাস্—একেবারে টুক্‌রো হ'য়ে যাবে খুঁজেও পাওয়া যাবে না দেহের একটা সামান্য হাড়ও। মহুয়া আর অমিতের বুকের ভেতরটা কাঁপছে, ভয়ে ওরা জিজ্ঞেস করে—"আরো কতদূর নিয়ে যাবেন দেবীদা ?

''আর না, এইখানেই ভাল।''

সামান্য একটু সমতল জায়গা আর তারই উপর একটা মাঝারি শিমুল গাছ। পকেট থেকে কালো কুচ্‌কুচে একটি ছোট্ট পিস্তল বের করলেন দেবীদা।

অমিত আর মহুয়া দেখেই আশ্চর্য হ'য়ে যায়। বাঃ, বেশত এটা নিয়ে কি কর্বেন দেবীদা ?

তোদের শিক্ষা দেবো কেমন করে লক্ষ্য ভেদ করতে হয়। আরো খানিকটা ওরা এগিয়ে গেলো গভীর স্তব্ধ বুনো ঝোপঝাড়ের মধ্যে পকেট থেকে কার্তুজ বের করে ভরে দেন দেবীদা দেশলাইএর মতো ছোট খাপটায়। তার পর সব ঠিক করে চারদিকে তাকিয়ে নেন্। "তোরা

দেখে যা কেমন করে ছুড়তে হয়। প্রথমটা চালাবো আমি, তার পরের গুলো তোরা''—শিমুল গাছের গোড়া লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লেন দেবীদা—গুড়ুম শব্দ করে এক রাশ ধোঁওয়া বেরিয়ে গেলো—দেবীদার হাত একটু কাঁপলো না। মহুয়া আর অমিত শব্দ শুনেই চমকে উঠলো।

"নে এর পর তোর পালা''—দেবীদা পিস্তলটি অমিতের হাতে তুলে দেন। আস্তে আস্তে পিস্তলটা হাতে নিলো অমিত। ওর হাতটা একটু কাঁপলো।

দেবীদা তুলে ধরে বল্লেন—নে এর পর ঘোড়া টিপ্। অমিত ঘোড়া টিপল—গুড়ুম শব্দ করে একরাশ ধোঁওয়া আকাশে ছড়িয়ে গেলো......সাফল্যের আনন্দে অমিতের মুখখানা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। এবার মহুয়ার পালা অমিতের সাফল্যে মহুয়ার আশঙ্কাও অনেকখানি কমে গেছে—সে নিজেই এগিয়ে গিয়ে পিস্তল হাতে নিয়ে গোড়া টিপলো আবার সেই গুড়ুম শব্দ এক রাশ ধোঁওয়া ছোট্ট এক টুক্‌রো মেঘের মতই আকাশে ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল। সুন্দর পিস্তলখানি। এটি ধরার সঙ্গে সঙ্গেই মহুয়া বুকের মধ্যে পেলো বাঘের বল, মনে জাগলো অভিনব একটা সাহস। দেবীদাকে ডেকে ও বলে উঠলো—"এতে আমাদের কি কাজ হবে দেবীদা ?''

কেন এই নিয়েইত আমাদের আগুনের খেলা সুরু হবে : এই দিয়েই ত অত্যাচারীকে টুঁটি চেপে মারা হ'বে—পৃথিবীকে

নূতন করে গড়ে তোলার জন্য নির্মমভাবে ওর পুরানো লোনা ধরা দেওয়ালগুলো ভেঙে চুরমার করে দিতে হ'বে। বহু মানুষের আত্মদানে আসবে অগণিত মানুষের মুক্তি মানুষ জাতের মুক্তি। অনেক রাতে ওরা বাড়ী ফিরে গেল।

দিন যায়।

বিপ্লবীরা অনেক ছেলে মেয়ে নিয়ে বেশ পুষ্ট হ'য়েছে। দেবীদাই এদের চালনা করেন। বর্ষা দিনের অন্ধকার কালো রাত—সাঁই সাঁই শব্দে উন্মাদ বাতাস বয়ে যায়—শত শত পাগলা ঘোড়া মেঘের বুকে যেন অশান্তভাবে টগবগিয়ে ছুটে চলেছে—ওদের চলার ক্ষিপ্রতায় মেঘের বুকে তড়িতের ঢেউ খেলে যায়। অন্ধকারের মধ্যে ছেলেরা একে একে জুটলো··· একটা ভাঙা পোড়ো বাড়ীতে। সাজসজ্জা স্থুরু হ'লো—কালো মুখোস, হাফ্‌প্যাণ্ট, লম্বা কালো সার্ট, ঘাড়ে একটা করে কালো স্কার্ফ···হাতে হাণ্টার, কোমরে বেল্টে আঁটা পিস্তল বা টর্চ, চামড়ার খাপে ঝোলানো ছোরা। দেবীদাও এইভাবে সজ্জিত। কেউ অন্যকে চিন্‌তে পারে না—কেউ অন্যের বড় একটা পরিচয় জানে নি।

বাঁশী বাজালেন দেবীদা। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে গেলো ছেলেরা। বিদীর্ণ মেঘের বিদ্যুতে এক একবার আলো খেলে যায় আবার অন্ধকার—ঘন কালো কুটিল অন্ধকার। সহর পার হ'য়ে ওরা মাঠে নামে, মাঠ পার হ'য়ে আসে নদীর বালুর বুকে···দুরন্ত বাতাস শোঁ শোঁ করে কেঁদে চলেছে। গভীর

রাত্রির স্তব্ধতাকে ভেঙে ভেসে আসে দেবীদার স্পষ্ট অথচ ধার হুকুম—"আমরা নদীর জলের কাছে এসে পড়েছি দু'দলে বিভক্ত হ'য়ে চলে যাও—নৌকা কোথায় নোঙ্গর করা আছে দেখ!"

সবাই চল্লো—কয়েকজন পূবে আর কয়েকজন পশ্চিমে। পনের মিনিট পরে পশ্চিম দিকের ছেলেরা নৌকাটাকে বালুর চরের উপর দেখতে পেলো—পকেট থেকে বাঁশী নিয়ে এদের একজন বাজালো আর সেই শুনে পুব মুখা ছেলেরা ফিরে চললো পশ্চিম মুখে। একটু পরেই সবাই একত্র হ'লো। দেবীদা এলেন।

ভরা স্রোতে নৌকা ছেড়ে দিল ছেলেরা—দেবীদা ধর্লেন হাল, আর ছেলেরা দাঁড় বা হাতা···শন্‌শন্‌ করে নৌকা ছুট্‌লো শন্‌শন্‌ করে বইলো দুরন্ত ক্ষ্যাপা বাতাস—গাঢ়ো অন্ধকারে সবই থম্‌থম্‌ করছে—দু'একটা রাতের পাখী ভাঙা গলায় চীৎকার করে চলেছে।

অগাধ জল খল খল ছল ছল করে বয়ে চলেছে দুরন্ত ভাঙনের নেশা নিয়ে···নদী যেন তার স্পর্ধাকে কূলের মধ্যে আয়ত্ত্বের মধ্যে চেপে রাখতে পারছে না—দূরে দূরে বালি ও মাটির পাড়গুলো ঝপাৎ শব্দ করে করে ধ্বসে পড়ছে···ছপাৎ করে লাফিয়ে উঠ্‌ছে জলের অশান্ত ঢেউ। লক্ষ সাপের ফোঁস ফোঁসানির মত অসংখ্য ঢেউ গর্জন করছে ···ভাঙতে চাইছে ঐ নদী পুরানো বাড়ীঘর, ধ্বসিয়ে দিতে চাইছে বহুদিনের জীর্ণ ভিত···আবার প্লাবনের পলিমাটির মমতা দিয়ে গড়ে তুলতে চাইছে নূতন সম্পদ—জন্ম-

লাভ করবে ঐ নরম মাটির মাতৃ-জঠরে অসংখ্য বীজের অঙ্কুর —মানুষের বাঁচার নূতন ফসল। আধ ঘণ্টা নৌকা বাওয়ার পর নৌকাটা বাধা পেলো বালুর চড়ায় মুহূর্তে ঘুরে গেল ওটা— দড়ি ধরে নীচে জলের মধ্যে নেমে গেলেন দেবীদা—তারপর টেনে তুল্লেন ওখানাকে আবার ভরা স্রোতের মুখে। কিছু পরেই নৌকা তীরে ভিড়লো। সকলকে নেমে যেতে বল্লেন দেবীদা। খাড়া পিছল পাড় কাদায় পা টিপে টিপে ছেলেরা উপরে উঠতে লাগলো—উপরে উঠার পর ওরা চললো ধান বাড়ীর সংকীর্ণ সর্পিল আলের উপর দিয়ে—কাদা, জল, ঘাস আর ধান গাছ ঠেলে ঠেলে ওরা পথ চলে—মাঝে মাঝে টর্চ ফোকাস করে পথ দেখে নেয়—ঝিঁঝিঁরা এক ঘেয়ে ডেকে চলে—ব্যাঙগুলোর কট্-কট্ শব্দ। প্রতি পদক্ষেপে সাপে কামড়ানোর ভয়, কাঁটার মধ্যে আট্কা পড়ার সম্ভাবনা গভীর রাত্রে ওরা এসে পৌঁছায় একটি ছোট্ট পল্লীতে—নিঝুম রাতের ঘন অন্ধকারে হতচেতন গ্রামটি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। সংকেত মতো ছেলেরা গ্রামের প্রতিটি ঘরে শিকল তুলে দিল। তারপর ধীরে ধীরে জড়ো হ'লো একটি প্রাচীর ঘেরা দ্বিতল ঘরের পিছনে। একটু পরেই ভেতর থেকে দরজা খুলে দিয়ে দেবীদা ডাকলেন—"ভেতরে এসো।" ছেলেরা ভেতরে গেলো।

নিঝুম রাতের ঘন অন্ধকারে সমস্ত বাড়ীটা থম্ থম্ করছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন দেবীদা—বৈঠকখানায় দরোয়ান আর চাকরগুলো ঠাণ্ডা হাওয়ায় জড়শড় হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

দেবীদা ওদের নাকের উপর ধরলেন ক্লোরফর্মের শিশিটা···ঘুমের মধ্যে আরো আড়ষ্ট হ'য়ে পড়লো লোকগুলো। তারপর ওদের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে ছেলেরা বেরিয়ে গেলো। একটি প্রকোষ্ঠ খুলে দিয়ে দেবীদা ওদের ভেতরে ডাকলেন।

তিনটি প্রাণী সাদা ফুলের মতো বিছানায় পড়ে ঘুমুচ্ছে—কারুকার্য করা সৌখিন পালঙ্কে নেটের মশারী ঝুল করে টাঙানো···পাশে বড় বড় পাশ বালিশ। একটি গৌরবর্ণ পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে···ওরই পাশে একটি তরুণী লাবণ্যের শ্রীতে সারা দেহ আচ্ছন্ন—মুখের মধ্যে কোথাও বিষাদের ছায়া বা উদ্বেগের লেশ নেই। স্বামীর কণ্ঠ বেড়িয়ে আছে সুকোমল বাহুর বেড়া দিয়ে আর ওরই বুকে মাথা রেখে আবেশ বিহ্বল ঘুমের মধ্যে এলিয়ে পড়েছে নিশ্চিন্তে। আর একটু দূরে পালঙ্কের ওদিকে পাশ বালিশের আড়ালে ঘুমিয়ে আছে ওদের দু'বছরের শিশুপুত্রটি।

একটি ক্ষীণ মোমের আলো জ্বলছে···পাশের একটি টেবিলে এক গ্লাস জল ··আর এক বাটি দুধ ঢাকা রয়েছে দু'টো খাতার নীচে। দেবীদা ও ছেলেরা ঢুকে পড়েছে···একটু পরেই দেবীদা যুবককে নড়িয়ে ডাকলেন—'উঠন আমরা এসেছি।' ঘুমের ঘোরে একবার পাশ ফিরলেন তিনি বাহুর আবেষ্টনীতে স্ত্রীকে আরো কাছে চেপে ধরলেন—স্নিগ্ধ কোমল ফুলের মতো মুখখানা আরো একটু হেলে পড়লো স্বামীর বুকে।

দেবীদা এবার একটু বেশী জোরে ডাকলেন—"বাবু উঠুন

আমরা এসেছি।" চম্‌কে যুবকের ঘুম ভেঙে গেলো, বিস্মিত হ'য়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"কে আপনারা, এঁ্যা-কি চান?" ভীত বিহ্বল সে চাউনি। মেয়েটিও উঠে পড়েছে···একটি কথাও বল্‌তে পারছে না মুখের কথা মুখেই জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে···শিশুটাকে বুকে চেপে ধরে কাঁদছে।

দেবীদা নরম সুরে বল্লেন—আপনারা কথা বল্‌বেন না, সাহায্য করার মতো কেউ নেই এখানে, তবে আমরা আপনাদের কোন অনিষ্ট কর্বোনি শুধু কিছু টাকা খুঁজচি।"

যুবক ভীতভাবে বল্লেন—কত—কত—টা—কা—আ—চা—ই আ—প্—নার—? "মাত্র হাজার দুই হ'লেই চলবে।" আস্তে আস্তে সিন্দুকের চাবীটি দেবীদার হাতে তুলে দিলেন তিনি—"আপনার ইচ্ছামত আপনি নিন্ কেবল আমাদের প্রাণে মারবেন না।" আতঙ্কিত আর্ত সেই স্বর। দেবীদা অল্প সময়েই বুঝে নিয়েই আবার ফিরে চল্লেন দলবল নিয়ে—সেই কাদা, মাঠ, জল, ঘাস, ধানগাছ কাঁটা, সাপ, ব্যাঙ···। সমস্ত রাত জাগরণের ফলে ছেলেদের চোখের পাতাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে আস্‌চে। হিমেল হাওয়ায় জড়শড় হ'য়ে পড়ছে ওরা। একটু পরেই ওরা নদীর কিনারে এসে পড়ে···একটু পরেই একটা মাটির পাড় আছড়ে জলে পড়লো—পাক খেয়ে খেয়ে গুমরে উঠলো অশান্ত বেনো জল···ছেলেরা ভাবলে দেবীদা চাপা পড়েছে···কিন্তু নীচ থেকেই তাঁর কথা ভেসে এলো—"সুবিধে পেলেই নেমে পড়ো এখানে নৌকা বাঁধা আছে।" সবাই জড়ো হ'লো নৌকার

মধ্যে আবার দ্বারকেশ্বরের ভরা বন্যায় নৌকা ছেড়ে দিলে ছেলেরা···তর তর করে তীর বেগে নৌকা ছুট্‌লো নদীর বুকে।

এপারে ভিড়লো নৌকা, বালুর চড়ায় নোঙ্গর আট্‌কে নীচে নেমে গেল ছেলেরা। লুটের মাল সব গুটিয়ে নিয়ে দেবীদা সরে পড়লেন···শূন্য নৌকাখানাকে বন্যার মুখে ছেড়ে দিয়ে ছেলেরা হো-হো করে হেসে উঠ্‌লো।·········

পরের দিন সকাল হয়। অপ্রচুর ঘুমে তখনো মহুয়া আর অমিতের চোখগুলো ঢুলুঢুলু করছে···ভাল করে চাইতে পারে না ওরা বারবার চোখে মুখে জল দেয়, বেলা বাড়ে স্নান করে খেয়ে স্কুলে যায়। স্কুলের ঘণ্টাগুলো একটা ম্যাঁজ্‌ ম্যাঁজে ভাবের মধ্যে কেটে যায়।

স্কুলের ছুটির পর ছেলের দল হল্লা করে বাড়ী ফেরে। অমিত আর মহুয়া সকলের পিছু পছু বাড়ী ফিরছে—"দেখ্‌ মহুয়া, দেবীদা টাকাগুলো নিয়ে কি করে বলত?" অমিত প্রশ্ন করে মহুয়াকে।

"কি জানি দেশের কাজে লাগান বোধ হয়।" উত্তর দেয় মহুয়া অন্যমনস্কভাবে পথ চল্‌তে চল্‌তে বাড়ী ফিরছে ওরা··· মিলের মজুরগুলোও বাড়ী ফিরছে ওদেব সারাদিনের কাজের খাটুনীর পর একচোট বেশ পুরোদম মদ খেয়ে—টল্‌তে টল্‌তে চলেছে মাতালগুলো। একটা মদ খেয়ে নালায় পড়ে রয়েছে—কাছে আসে মহুয়া আর অমিত—কিন্তু এ্যাঁ একি? এ যে ওদের দেবীদা! ওদের বিপ্লবী গুরু দেবীদা মদ খেয়েছে হ্যাঁ

তাইত আরো নিকটে সরে যায় অমিত আর মহুয়া। একটা নোংরা টক্ গন্ধ ওর মুখ থেকে বের হ'চ্ছে ঘৃণায় দুঃখে ক্ষোভে মহুয়া আর অমিতের অন্তরটা রি রি করে ওঠে। দুঃখে বেদনায় ঘৃণায় কালো হ'য়ে যায় ওদের মুখ দুটো।

আদর্শ নেই, মনুষ্যত্ব নেই, কিছু নেই তবে কি ওরা সত্যই প্রতারিত হয়েছে ? ওরই নির্দেশে ওরা নিরীহ দেশবাসীর বাড়ী লুট করেছে মুহূর্তে মহুয়ার মনে ভেসে ওঠে গ্রামের জমিদারের সেই মিনতি ভরা করুণ চাউনি···। এই দেবীদা মাতাল চোর দেবীদা এরই জন্যে ওরা ঐ নীচে নেমেছে। এই দেশের কাজ যার জন্যে ওরা সামান্য সম্মানটুকুও হারাবে। না, তা হ'তে পারে না—এ দল ছেড়ে দেবে ওরা।

দিন যায়।

অমিত আর মহুয়া দেবীদার কোন খোঁজ নেয় নি। মানুষের ভালো লাগাটা কি অদ্ভুত, এক মুহূর্তের ঘটনায় যাকে খুবই ভালো লাগে যার কাছে জীবন মন সঁপে দেওয়া যায় আবার এক মুহূর্তের ঘটনায় তারই উপর মনটা বিষিয়ে ওঠে তাকে দূরে ঠেলে দিতে মন চায়। মহুয়া আর অমিত এড়িয়ে চলে দেবীদাকে —আবার পুরানো সুরে ওদের জীবন চলে, মীনাদিকে ডেকে দেয় ওরা—বেড়ায়, গল্প করে পড়াশুনোয় মন দেয়—।

আকাশে মেঘ করেছে। গুমোট হ'য়ে আছে, প্রকৃতিটা—জলও নেই, ঝড়ও ওঠেনি—বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারে নি মহুয়া। ঘর ছেড়ে ফাঁকা মাঠের দিকে একাই বেরিয়ে

পড়ে—উদ্দেশ্যবিহীন যাওয়া—ছোট ছোট গ্রামগুলি পার হ'য়ে চলেছে মহুয়া—একটু দূরেই শোনে কতকগুলো লোক জমে চেঁচাচ্ছে—মার শালাকে দূর কর ব্যাটাকে,—সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে হতভাগা মেয়েছেলেগুলোকে পথে বসালে—মাঝে মাঝে কিল চড় বর্ষণের শব্দ। লোকগুলো একজনকে ঘিরে তর্জন গর্জন করছে যেন। আরো এগিয়ে যায় মহুয়া—দেখে দেবীদাকে ঘিরে লোকগুলো চেঁচাচ্ছে মদ খেয়েছে দেবীদা—একবার মনে করে ফিরে যায়—আবার কি মনে হয় ওর জনতার দিকে এগিয়ে চলে তখনো লোকগুলো সমানে চেঁচাচ্ছে—দূর কর শালাকে—জুতিয়ে লবেজান করে ফেল।" মহুয়া ওদের বাধা দিয়ে বলে—"কাজ নেই ওকে মারধোর করে, ভুল যদি ভাঙে তা আপনিই ভাঙবে···মারধোর করে স্থবিধা হ'বে না।" লোকগুলো একটু শান্ত হয়, টলতে টলতে চলে দেবীদা মহুয়া ওকে ধরে ধরে নিয়ে যায়। কিছু দূর গিয়েই ওরা আসে একটা পুরানো বাড়ীর সামনে দেবীদা থামে এইটেই আমার বাড়ী, চল মহুয়া আমাকে বাড়ী পৌছে দিবি। দেবীদাকে ধরে ধরে মহুয়া দেবীদার বাড়ী ঢোকে, পুরানো সংস্কারহীন মেটে বাড়ী··· হেথায় হোথায় ছেঁড়া বালিশ, কাঁথা, চেটাই···।

সামনেই মহুয়ার চোখে পড়লো একটি শীর্ণকায় পাঁচ ছ'-বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুড়ি চিবুচ্ছে···হাড় পাঁজরাগুলো স্পষ্ট গোণা যায়···এরই একটু দূরেই একটা তু'তিন বছরের মেয়ে আরো বেশী শীর্ণ, আরো বেশী রক্তহীন ওর শুক্নো হলদে

গায়ের চামড়ার নীচের নীলচে শিরাগুলো স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। মাতাল দেবীদা টলতে টলতে বলে—"একটা মাদুর পেতে দাও ত গৌরী, ওরা আমায় খুব মেরেছে।" মহুয়া বুঝে গৌরী দেবীদার স্ত্রীর নাম। বের হ'য়ে আসে ক্ষীণাঙ্গী মলিন একটি মেয়ে···ময়লা বহুছিদ্র কাপড়ের খানিকটা পরে আর খানিকটা গায়ে দিয়ে। একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে দেয় মেয়েটি উঠানের উপর। ওর চোখের কোণাটা জলে ভরে গেছে···ছোট মেয়েটা ওকে চেপে ধরে চেঁচায়···ছেলেটা একরাশ মুড়ি আর কয়েকটা পেঁয়াজের কোয়া ছুড়ে ফেলে দেয়। করুণায় দুঃখে সহানুভূতিতে মহুয়ার মন ভ'রে যায়। বিপ্লবী দেবীদা যে একদিন এনেছিল বিস্ময় আর একদিন ঘৃণা আজ আনে একটা গভীর সহানুভূতি। মহুয়া ভাবে সত্যই কি দেবীদা মদ খায়···সত্যই কি দেবীদা নীচ, সত্যই কি ও ঘোর মাতাল চোর, গুণ্ডা···ভাবতে ভাবতে বের হ'য়ে যায় মহুয়া।

*　　*　　*　　*　　*　　*

পঞ্চাশের কঠিন দুর্ভিক্ষ দেশের উপর দিয়ে বয়ে চলে। দেশের লোক দলে দলে মরছে, কেউ মরছে নীরবে ঘরের কোণে, কেউবা পথে-ঘাটে কুকুর বেড়ালের মত···এক মুঠো ভাত, একটু ফেন দু' পাতা শাকের জন্য অগণিত মানুষ হাহাকার করছে। দেশের জমিদারদের মুখে ফুটেছে একটা সুন্দর হাসি—হায়নার মত ক্রুর, সাপের মত কুটিল, বাঘের মত লোলুপ, শেয়ালের মত ধূর্ত সে হাসি। হু হু করে সঞ্চিত ধানের দাম বেড়ে

চলেছে। জোঁকের মত শাসালো হ'চ্ছে ওদের শরীরগুলো মেদে আর মাংসতে, রক্ত আর মেদে। ওরা সংকাজে মন দিয়েছেন—পুকুর কাটাচ্ছেন, বাড়ী তুলছেন, সস্তায় অসংখ্য মজুর পাওয়া যাচ্ছে—মানুষ বিক্রী করছে দেহকে…একমুঠো ভাত আর একটু ফেনের জন্যে।

কংগ্রেস তার আন্দোলন স্থরু করছে। ১৭ই আগষ্ট শনিবার কয়েক হাজার বুভুক্ষু মানুষ লুট করলো ধনী ব্যবসায়ীর চালের গুদাম। ঘটনাক্ষেত্রে বহু পুলিশ সমবেত হ'লো—মুহুর্মুহু গুলি চললো পুলিশের, তবুও ওরা লুঠ না করে গেলনি। পড়ে রইলো অসংখ্য হত ও আহত মানুষ—নালায়, পচা নর্দমায় বয়ে গেলো লাল রক্তের ঢেউ…পচা নর্দমার কাল্‌চে মাটিতে বয়ে গেলো তাজা রক্তের ঢেউ…জমা হ'লো কঙ্কালের স্তূপ…শেয়াল কুকুর-গুলোর মধ্যে উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেল…শকুনিগুলো আকাশ থেকে ঘুরে ঘুরে নেমে এলো মাটিতে নরকের মধ্যে দশ বার বছরের একটা মেয়ে উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে মড়ার গাদায়। বিশীর্ণ দেহটা ক্ষুধার জ্বালায় বিবশ হ'য়ে পড়েছে—একটা জ্বালাময়ী আগুন পাক খেয়ে খেয়ে মোচড় দিচ্ছে পেটের মধ্যে বুকের মধ্যে—পুড়িয়ে দিচ্ছে ওর নাড়িভুড়িগুলো…ঝাঁঝরা করে ফেলছে ওর ঘূণ ধরা হাড় পাঁজরাগুলো। মড়ার উপর অনেকগুলো শেয়াল কুকুরের হানাহানি কাড়াকাড়ি চলে—বীভৎস পশু-গুলোর উল্লসিত চীৎকার…ঐ জ্যান্ত মেয়েটাকে একটা শকুন এবার ঠোঁট দিয়ে আঘাত করলো—ও ওর বিশীর্ণ হাত দু'টো

দিয়ে ওটাকে তাড়াতে চেষ্টা করলো কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা শেয়াল ওর আর একটা পা ধরে টানছে কিন্তু তখন আরো দু'তিনটে শেয়াল কুকুর ওর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে—একটা গোঙানি, একটা অস্ফুট কাৎরানি, একটা করুণ মর্মভেদী যন্ত্রণার অভিব্যক্তি তার পরই সব শেষ।

*   *   *   *   *   *

শোনা যায় দেবীদাই এই জনতাকে চালিত করেছিলেন। পুলিশের ওয়ারেণ্ট বের হয়। দেবীদা গা ঢাকা দেন। দেবীদা প্রায়ই বাড়ী আস্তে পারেন না এক আধ দিন কচিৎ আসেন। চার দিকে পুলিশের গুপ্তচর···বিশেষ করে ওরা ঘুরে বেড়ায় ওর বাড়ীর চারদিকে···দেবীদার ছেলেমেয়েগুলো না খেয়ে আরো শীর্ণ হ'য়ে পড়েছে আর গৌরী ওর দুঃখের যে কোন সীমা আছে বলে মনে হয় না। গ্রামের অনেকেই খেতে পায় না তা ওরাই বা কি সাহায্য করতে পারে? রোগ, দুঃখ, অভাব, অসুখ হাজার রূপে এদের গ্রাস করতে চায়। বৈশাখের খর উত্তাপ আকাশ থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে—সমস্ত পৃথিবীটা বেদনায় কেঁপে কেঁপে উঠে। চারদিক খাঁ খাঁ করে তপ্ত বালুর উপর থেকে আগুনের হল্কার মত শিস্ আর ভ্যাপ উঠ্তে থাকে। গ্রামের পুকুর ডোবার জলও শুকিয়ে গেছে।

দেবীদা পুলিশের চোখ এড়িয়ে চলতে থাকেন দিন কাটান—মাঠে, প্রান্তরে, নদীর ধারে, গাছের উপরে, খালের নীচে, ঝোঁপে,

পোড়ো বাড়ীতে, শ্মশানে, মহলদারের মহলে, চাষাদের মাচায়। বিকেল আর সন্ধ্যায় রাতের প্রথম ভাগে অমিত আর মহুয়া ওর কাছে থাকে কিন্তু রাত কাটে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। সেদিন বিকেল থেকেই কাল বৈশাখীর ঝড় উঠছে আর তারি শাসনে চারদিকটা কাঁপছে। ধূলো আর বালিতে সমস্ত পৃথিবীর বুকটা ধোঁয়াচে ও মলিন হ'য়ে পড়েছে। সারাদিনের মধ্যে দেবীদা কিছুই খেতে পান নি গাছের আম, ছ'একটা পাকা বেল, এক খালা পিয়াল ···আর এক পেট জল। জল খেয়েই সমস্ত দিনটা কেটেছে। মহুয়া আর অমিত চেষ্টা করতে গেছে কিছু খাবার আনার জন্য। দুরন্ত ঝড়ে বাইরে থাকাও চলে না···তাই দেবীদা চলেছেন শ্মশানের শিবমন্দিরের দিকে—পথের সাপ ও কাঁটাকে তুচ্ছ করে।

ঝড়েই শেষ হল নি। সমস্ত আকাশ থেকে ঝরে পড়লো মুষলধারে বৃষ্টি। মহুয়া আর অমিত কিছু চিড়াগুড় সংগ্রহ করেছে—বৃষ্টি যে আর ধরে না। ক্রমাগত ছ'আড়াই ঘণ্টা বৃষ্টি হওয়ার পর দুর্যোগ কাট্‌লো।

অমিত আর মহুয়া টর্চ আর লাঠি নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দেবীদার খোঁজে চললো।

পরিচিত জায়গাগুলোয় ওরা দেবীদাকে খুঁজে পেলনি তাই চললো শ্মশানের পথে। মাঝে মাঝেই ওরা ভয় পায় আর চমকে ওঠে প্রতিপদক্ষেপে ওদের মনে হয় পিছনে কে যেন আস্‌ছে। ওদের সঙ্গে খাবার চাইবার জন্য অশরীরী কে যেন

কিছু নিয়েছে। ভয়ে মহুয়ার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে। অমিতও সাহস হারিয়ে ফেল্‌ছে কিন্তু তবু ওদের খুঁজে বের করতে হ'বে দেবীদাকে। সারাদিন যে মানুষটি খায়নি তাকে কিছু খাওয়াতেই হ'বে। মাঠের বুকে নামে ওরা অসংখ্য ঝোপঝাড় খাল বিল পার হ'য়ে চলে। রাত এক প্রহরের সময় ওরা আসে একটা ছোট্ট জোড়ের কাছে—অনেক ঝোপঝাড়ে জোড়টা ভরে আছে। দু'জনে হাত ধরাধরি করে চলেছে···একটু পরেই ওরা শুনতে পায় হাত কুড়ি-পঁচিশ দূরে কিসে যেন হাড় চিবুচ্ছে। অস্পষ্ট আলোতে কিছুই দেখা যায় না—টর্চ ফোকাস্ করার সাহসও হয় না। মহুয়া, অমিতের একটা হাত চেপে ধরে দ্রুত চল্‌তে থাকে··· ভয়ে দম আটকে আস্‌তে চায়···জোর নিঃশ্বাস ফেল্‌তেও ভয় হয়। বাতাসে ভেসে আসে, একটা তীব্র বোট্‌কা গন্ধ, ভয়ে হিম হ'য়ে যায় ওদের বুকের রক্ত···তবুও ওরা বল্‌তে থাকে। কোন রকমে জোড়টা পার হ'য়ে ওরা আসে এপারের ফাঁকা জায়গাটাতে। কাছেই মড়া শ্মশান ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে মড়ার লেপ কাঁথাগুলো বাঁশের তাড়াগুলো আর শূন্য কলসীগুলো। সমস্তটাই খাঁ খাঁ করছে একটু পরেই ওরা এসে পড়ে একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় তখনো ওদের বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করে কাঁপছে···কিন্তু এখানে আর এক নূতন উৎপাত সুরু হয়···গাছের ডালে শোনা যায় একটা খস্‌খস্ শব্দ ···কে যেন নাম্‌ছে। পাতার ঝড় ঝড়ানি শোনা যায়

মহুয়া আর অমিত ছুটতে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। শির শিরে ঠাণ্ডা বাতাসে ওদের যখন জ্ঞান হয় তখন ওরা দেখ্‌লো দেবীদা পাশেই বসে আছেন—আরো ছু'একজনও যেন রয়েছে ওরা লাফিয়ে উঠ্‌তে চায়—"এঁ্যা" দেবীদা, আমরা কোথায়?" "জন্তার বৈষ্ণবদের আখড়ায়।"

এখানে কি করে এলাম? মহুয়া বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করে। মৃছ হেসে দেবীদা বল্লেন--বোকারা ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে যাস্ আমি উঠেছিলাম ঐ গাছটায় এই সাহস নিয়ে দেশের কাজ করবি? লজ্জায় অমিত আর মহুয়ার মুখ ছ'টো ছোট হ'য়ে যায়।

দেবীদা এদের মাথায় গায়ে হাত বুলোতে থাকেন। রাধানাথ বাউলও কাছে আসেন হাস্‌তে হাস্‌তে বলেন "কি দাদাবাবু আজ একটু আধটু হ'বে নাকি? "[illegible] কি ঠাণ্ডায় ভালইত—মুচকি হেসে দেবীদা বলেন। "কি দেবীদা?" বিস্মিত অমিত জিজ্ঞেস করে।

কিছু না। এই এক আধ্‌টু…। বাউলের আশ্রমে ধূনিজ্বলে রাধানাথ বাউল কল্‌কে সেজে আগুন চাপান তারপরই মারেন একটা লম্বা টান…আস্তে আস্তে প্রাণায়ামের ভঙ্গিতে ধোঁয়াটুকু উদরস্থ করেন……তারপর কলকে নিলেন হরেকৃষ্ণ বাউল। হরেকৃষ্ণ বাউলের লম্বা দাড়ি গোঁফের আবর্ত্তে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাক্ খেয়ে খেয়ে মরে। কল্‌কেতে টান দিয়ে ডাক ছাড়লেন তিনি—বোম্ ভোলা, বোম্ ভোলা, ভোলা ব্যাটা কি জয়, বোম্ বোম্।

দেবীদা মুচ্কি হেসে প্রসাদ পাবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন, এই যে দিই দেবীবাবু। বাউলজী কলকেটি দেবীদার হাতে দিলেন। দেবীদা টান্তে লাগলেন—উঃ কী ভীষণ সে টান কলকের আগুন দপ্ দপ করে বার বার জ্বলে ওঠে আর দেবীদা ঘন ঘন ডাক ছাড়েন—বোম্ ভোলা, বোম্ ভোলা।

অমিত আর মহুয়ার এত দুঃখেও হাসি পায়। ধন্য এই দেবীদা, একেই বলে জেন্তু স্বাধীন মানুষ যে সংসারের ভাল মন্দ কোন কিছুরই মধ্যে আট্কা পড়লেই কোন সংস্কার কোন নীতি ওকে আয়ত্ব করতে পারেনি দারিদ্র ওকে নিঃশেষ করতে পারেনি অভাব ওকে মুষড়ে দিতে পারেনি, দুঃখ ওকে কাতর করতে পারেনি। দেবীদা নির্বিকার কল্কেতে টান মারছেন কোন ইষ্ট অনিষ্টের ধারও ধারেননি। অনেক রাত হ'য়েছে ঘরে ফিরে যাবার জন্যে অমিত আর মহুয়া আকুল হয় কিন্তু বোম্ ভোলা দেবীদার কি কোন খেয়াল আছে সেদিকে। রাধানাথ বাউলের স্ত্রী মেনকাসুন্দরী কাছে আসে চোখের কোণে একটু খানি হেসে জিজ্ঞেস করে—"কি দাদাবাবু খুব ত কলকেতে দম দিচ্ছেন। বলি, সারাদিনের মধ্যে পেটে কিছু পড়েছে? মুচ্কি হেসে দেবীদা উত্তর দেন—"না, দিদি সে ভাগ্য সব দিন হয় না।"

"তবে খেলে কি শুনি?" সহানুভূতিতে ভরা ওর চোখ দু'টো ছল্ছল্ করে আসে। "আজ তা হ'লে কিছুই জোটেনি বেশ তোমার দেশের কাজ মাইরি। তা হ'লে এক মুটো দিই,

বাসিভাত তরকারীও তেমন কিছুই নেই উৎসুক্ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মেনকাসুন্দরী দেবীদার উত্তরের আশায় তাকায়।

"তা দিতে পার, মন্দ কী দিদি"—

একটা পাথরের থালায় মেনকা ভাত বাড়ে…সামান্য একটু কলাই এর ঝোল…একটু কুমড়োর তরকারী… আব গোটা কতক পেঁয়াজের কোয়া ছাড়ানো। একটা লঙ্কা তেল নুন মেখে মেনকাসুন্দরী দেবীদার থালার পাশে রাখে।

বাঃ চমৎকার! হেসে উঠেন দেবীদা। অম্লান মুখে ভাতগুলো খেতে থাকেন। ওঁর খাওয়ার মধ্যে একটা তৃপ্তির শিহরণ বয়ে যায়, চোখের তারায় ফোটে সে তৃপ্তির আলো।
—একটু আমানি দাও না, দিদি! দেবীদা একটু আমানি চেয়ে নেন্।

"একি করলেন দাদাবাবু, নেশাটা যে চটে যাবে?" উদ্বিগ্ন রাধানাথ বাউল বলেন।

"তা যাক্ ঠাণ্ডা হইত সত্তম।"

মেনকা সুন্দরী মুখ টিপে টিপে হাসেন। দেবীদা খাওয়া শেষ করেন, হাতমুখ ধুয়ে একটা পান মুখে ফেলে দেবীদা শান্তভাবে চিবুতে থাকেন। "বাউলজী আপনাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে নিশ্চয়ই?"—

আজ্ঞে হাঁ দাদাবাবু ঠাকুরের কৃপায় হ'য়েছে এক রকম। "ভজ মন গোবিন্দচরণ", গোবিন্দ বল মন—হাই তুল্লেন

রাধানাথ বাউল তাহ'লে একটা গান গাওয়া যাক্ একতারাটা একবার বের করুন—দেবীদা রাধানাথ বাউলকে বল্লেন।

"তা বেশ, তা বেশ"—বাউলজী সম্মত হ'লেন।

আমার কিন্তু ঘুম পেয়েছে, আলিস্যিটা একটু ভেঙে নিই দাদাবাবু আব্দারের সঙ্গে হরেকৃষ্ণ বাউল বল্লেন। সুরু হ'লো রাধানাথ বাউলের একতারার গাব্গুবাগুব্ শব্দ আর দেবীদার মিষ্টি গান—

> "ওরে মন আমার পাগল মন
> ও তুই চিন্লি নারে আসল রতন
> তোর মায়ের সেবা রইলো পড়ে
> তোর হেলায় কাটে সারাখন।"

চমৎকার লাগে দেবীদার এই বাউলগান। রাত বাড়ে দেবীদার মুখের দিকে তাকায় অমিত আর মহুয়া।

ও বুঝেছি, বাড়ী যাবি নাকি? ও বুঝেছি তোদের খুব দেরি হয়ে গেছে না? দেবীদা বল্লেন।

অমিত আর মহুয়া মাথা নামায় কিছুই জবাব দিতে পারে না "চল তোদের দাঁড়িয়ে দিয়ে আসি"—দেবীদা উঠে দাঁড়ান, অমিত আর মহুয়া দেবীদার পিছু পিছু চলতে থাকে। গভীর রাতটা সাঁই সাঁই করছে জনমানবের সাড়া শব্দ নেই—মাঝে মাঝে দু'একটা পাখী চীৎকার করে কয়ে উড়ে যায়। কালোমেঘের কোলে চাঁদ ওঠে—ওর উজ্জ্বল আলো নামে ছায়া আবছায়ার আস্তরণ ভেদ করে মাটিতে। এখন আর ভয় নেই দেবীদা

সঙ্গে আছেন। অমিত আর মহুয়া নিঃসঙ্কোচে চলেছে ভয় পাওয়া অশথ গাছটার প্রতিটি ডাল পালার দিকে লক্ষ্য করে করে—এর পরই সেই শ্মশানটা সেই পড়ে থাকা মড়ার লেপ কাঁথাগুলো বাঁশের তাড়াগুলো, ফাঁকা কলসীগুলো, বাতাস পেয়ে সোঁ সোঁ সাঁ সাঁ করছে·········একটু দূরেই একদল শেয়ালের কোরাস্ চীৎকার খ্যা খ্যাঁ খ্যাঁক্ খ্যাক হুক্কা হুয়াং হুক্ক হুয়া হুয়া কাক্কা—

এর পরই সেই ঢালু জোড়—এবার ওদের খাড়া পাড় দিয়ে উঠতে হ'বে। দেবীদাকে ডেকে ওরা বলে "জান দেবীদা, যাবার বেলায় কিসে যেন হাড় চিবুচ্ছিল।" তাহ'বে নেকড়ে টেকড়ে হ'বে বোধ হয়। এই খানেইত ভাগাড় মরা-গরু-বাছুর-গুলো এইখানেই ফেলে দেওয়া হয়।"

আরো খানিক এগিয়ে দিয়ে দেবীদা ফিরে যান। যাবার সময় মহুয়ার হাতে একটি পিস্তল দিয়ে বলেন—এইটে নিয়ে যা কাল, মনে করে আনিস্ কিন্তু। ওরা চলে যায়, অন্ধকারে দেবীদা একাই ফিরে যান্।

অমিত আর মহুয়া বাড়ীতে আসে। বেশ এক চোট ধমক আর গালাগাল খায় বাড়ীর লোকজনদের কাছ থেকে, ওরা কিন্তু কোন কথাই বলে না ঢাকা দেওয়া ঠাণ্ডা ভাতগুলো খেয়ে বিছানায় পড়ে ঘুমিয়ে যায়।

আর একদিনের কথা। বিকেলের দিকে মহুয়া একাই দেবীদার খোঁজে বের হ'য়েছে। দেউলীর আম বাগানে দেবীদা

একাই বিশ্রাম করছিলেন। মহুয়া যেতেই তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। সারাদিনের অনাহারে ওঁর মুখখানা শুকিয়ে গেছে তবুও ওঁর স্বাভাবিক হাসির কম্‌তি নেই। "চল মহুয়া ভোলার ওখানে যাই"—দেবীদা বলেন।

প্রায় মাইল দেড় দূরে ভোলার চাষ ক্ষেত—ভোলা দেবীদার একজন অনুগত কর্মী!

"আপনি যান্ আমি পরে যাব"—মহুয়া ফিরে যায়। দেবীদা একাই চল্‌তে থাকেন। আজ সারাদিনের মধ্যে দেবীদার একমুঠো ভাত, একটা রুটিও মেলেনি। মাথার ভেতরে যন্ত্রণা হয় ঝিম্ ঝিম্ করেছে মাথাটা—চোখের চারিদিকটা অন্ধকার হয়ে যায়······তবুও পথ চলেন দেবীদা। সন্ধ্যা নামে। ক্লান্ত সন্ধ্যা নামে মাটির ওপর। দিনের কাজ ধীরে ধীরে বন্ধ হয় আকাশ পথে ঝাঁক বেঁধে পাখীরা ফিরে যায় আপন আপন নীড়ে·····গোখুরের ধূলো উড়িয়ে গরুগুলো ফিরে যায় ওদের বাসগৃহে। একদল সাঁওতাল ছেলে মেয়ে গান গেয়ে বাড়ী ফিরছে। ওদের সুমিষ্ট বাঁশীর সুর সন্ধ্যার আকাশে আবেশের ঢেউ তুলে—দূরে শোনা যায় বাগ্দী পাড়ার মাদলের শব্দ ডুম্ ডুম্, ডুম্ মাতালদের উল্লসিত চীৎকার হো-হো-হো।

পথ চলেন দেবীদা। ছাতিম ফুলের মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগে এগিয়ে যান দেবীদা, আরো আরো—ভেসে আসে হেঁড়ে মদের নোংরা গন্ধ—পচানো ভাতের বাসি টক্ গন্ধ—আরো আরো

কাছে। মাদলের স্পষ্ট আওয়াজ ডুম্-ডুম্া-ডুম্-ডুম্। মাতালদের সম.বত চীৎকার হো-হো-হো।

"কিরে ভোলা বাড়ী আছিস্"—দেবীদা ভোলাকে ডাকেন এ্যাজ্ঞে আসুন আসুন দেবীবাবু—হে-হে-হে উছলে পড়লো ভোলার সরল হাসি। এ্যাজ্ঞে ভালো আছেন? কুশল প্রশ্ন করে ভোলা। উপস্থিত মাতালগুলো সবাই মিলে বল্লে—বসুন বাবু বসুন, একটা চটের থলে ঝেড়ে মোছে বস্তে দিল দেবীদাকে।

'এই যে বসি।' দেবীদা বসে পড়েন।

ওদের গান ও হল্লা চল্তে লাগ্লো সমান মাত্রায় অনেক-ক্ষণ দেবীদা একটা পর একটার বিড়ি ধরিয়ে টান্তে থাকেন। সভা ভাঙলো। ভোলার নেশাটাও অনেক কমেছে, দেবীদার কাছ ঘেঁসে বস্লো ভোলা। ভোলার পিঠে হাত বুলোন দেবীদা। "কী দাদাবাবু মুখটা ভয়ানক শুক্নো লাগছে? সারাদিন কিছু খাওনি বুঝি?"

কোন উত্তর না দিয়ে দেবীদা চুপ করে বসে থাকেন। "কৈ কিছু বলছনি যে, ও বুঝেছি। ভোলা চলে যায় ওর কুঁড়ের মধ্যে যেখানে ওর বৌ রাঁধছিল। মোটা কাঁকর মেশানো ভাঙা চালের ভাত, সামান্য একটু শাক, আর একটু ঝাল। ভোলার বুভুক্ষু ছেলেমেয়েগুলো এক দৃষ্টে চেয়ে আছে—উলঙ্গ ধূলিধূসর গায়ে শীতের বাতাস বইছে···উত্তুরে ঠাণ্ডা বাতাসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে ওরা···উনুনের পাশে আস্তেও পারে না মায়ের ধমকের

ভয়ে—আবার দূরে গিয়ে আগুন জ্বালাতেও পারে না পাছে খেতে না পায়। দেবীবাবুকে বসিয়ে দিয়ে ভোলা আসে ওর বৌয়ের কাছে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে ছেলেমেয়েগুলো শঙ্কিত হয় ভাতের দিকে আরো উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওরা তাকায়—করুণ সে চাউনি।

ভোলার ইঙ্গিতে ওর বৌ পাথরের থালায় ভাত সাজিয়ে দেয়...ব্যথায় ম্লান হ'য়ে যায় ছেলেমেয়েদের মুখগুলো। পরম যত্নে ভোলা ভাতগুলো দেবীদার কাছে নিয়ে যায়। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পাশে রাখে তারপর হাত জোড় করে বলে—আমার অপরাধ নিয়ো না দাদাঠাকুর। দেবীদার চোখ ফেটে জল পড়ে। এই তার দেশের ভাই এরাই আছে পতিত ঘৃণিত হ'য়ে। ভাতের গ্রাস মুখে তুল্‌চেন আর টস্ টস্ করে চোখের লোনাজল পড়িয়ে পরছেঁ ভাতের থালার উপর। সেবকের মত হাত ধরে অনুরোধ করে ভোলা—আরো খাও, আরো খাও নইলে মারা যাবে।

দেবীদা খায়। এই ভোলা, দেবীদার দেশের সত্যিকারের খাঁটি মানুষ কোন রকমে ভাত খাওয়া শেষ হয়। পাতের বাকী ভাতগুলো ভোলা ওর ছেলেমেয়েদের ধরে দেয়...সামান্য দু'এক মুঠো ভাত আর ফেন খেয়ে থাকে ওরা স্ত্রীপুরুষে। তারপর হাত মুখ ধুয়ে দেবীদার কাছে এসে গল্প করে।

একখানা পাতার চুটি ভোলা ধরায়, আর দেবীদা ধরান একটা বিড়ি...গল্প শেষ করে দু'বন্ধুতে কুঁড়ের এক পাশে পাশা-

পাশি ঘুমিয়ে যান। এমনি করে দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘোরে। দীর্ঘ এক বছর দেবীদা আত্মগোপন করে আছেন। অনাহার আর অর্ধাহারে শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়েছে। মুখের চারদিকে কালি জমা হ'য়েছে একটা পোড়া পাথরের মতই ওর মুখের রঙটা রুক্ষ ও কর্কশ। চোয়ালের পাশ দু'টো স্ক্রু আঁটা ইস্পাতের টুক্‌রোর মতো। দেবীদার ছেলেমেয়ে আর গৌরীর জীবনেও চরম দুঃখ বয়ে চলেছে ছেলেটার। অসুখ একথা অমিত আর মহুয়া তাঁকে বহুবার জানিয়েছে কিন্তু ওদের একবার দেখে আস্‌বারও অধিকার নেই ওর। গেলেই ধরা পড়তে হ'বে আর সমস্ত কাজ পণ্ড হ'বে। তবু একবার যেতেই হ'বে—আজকে। রাতের ঘন স্তব্ধ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দেবীদা চলেছেন নিজের বাড়ীর দিকে। প্রতি পদক্ষেপে গাটা ছম্ ছম্ করে ওঠে। নিজেরই পায়ের শব্দে নিজেই বার বার চমকে ওঠেন। একটা অজানা আতঙ্কে দেবীদার সমস্ত শরীরটা থর্ থর্ করে কাঁপে। সব বিসর্জন দিয়েও মানুষ ভয় করে। ভয় জিনিষটা মানুষের জীবনে স্বাভাবিক, নির্ভীক দেশ-প্রেমিক যার কাছে মরণ, জেল, আত্মীয় বিয়োগ শাস্তির ভয় নেই তারো আছে নিজের কাজের অসম্পূর্ণতার ভয়।

বাড়ীর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন দেবীদা। একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখেন আবার এগিয়ে যান। স্থির বাড়ীটা ওরই নিজের আজ যেন ওকে গিল্‌তে আস্‌ছে। মিট্‌মিট্ করছে একটি দীপের আলো। তিনটি অসহায় প্রাণী তাদের জীবনের

দুঃসহ দিনগুলি কাটিয়ে চলেছে। বিছানায় মিলিয়ে আছে একটি শিশু—দেবীদার ছেলে 'ও' তার পাশে আর একটি বিশীর্ণ দেহ সে দেবীদার মেয়ে আর গৌরী আগলে আছে এদের। মায়ের প্রাণের সমস্ত মমতা, দরদ, স্নেহ ঢেলে দিয়ে এদের ঘিরে রেখেছে। নিজে অনাহারে অর্ধাহারে থেকেও যথাসাধ্য এদের বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে চলেছে। দরজায় ঠেলা দিয়ে ধীরে ধীরে দেবীদা ডাকে—"গৌরী!"— গৌরীর মলিন মুখখানায় একটু ক্ষীণ হাসি ফোটে মুহূর্তে আবার মিলিয়ে যায় আতঙ্কে কালো হ'য়ে যায়।

—"আমি খুব অপরাধী গৌরী"—করুণভাবে দেবীদা কথা বলেন

'না' —উত্তর দেয় গৌরী।

'হাঁ'। চিরদিনই তোমাদের চেয়ে দেখলাম না। কেবল প্রাণের আবেগ মেটাতেই আমি ব্যস্ত। দেশকে ভালবাসা দরকার কিন্তু তাই বলে তোমাদের এইভাবে কষ্ট দেওয়ার ত কোন মানে হয় না।',

—"আপনি কি করবেন?" চোখের জল মোছে গৌরী, "এ আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের দেশের কোটি কোটি লোকের অদৃষ্ট।"—অদৃষ্ট না গৌরী, এই আমাদের বহুযুগের পাপের ফল, এ আমাদের কর্মফল। যে দুঃখ, যে অভাব যে বেদনা আমরা আমাদের হাজার হাজার ভাই বোনদের দিয়েছি এ তারই ফল।"—রুগ্‌ণ ছেলেটা পাশ ফিরতে চায়। অত্যধিক জ্বরের

উত্তাপে ওর সমস্ত শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় কেবলই ছট্ফট্ করছে। গৌরী তাকে কোলে তুলে নিয়ে কপালে চোখে মুহুর্মুহু জল দেয়। দেবীদা অপরাধীর মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছেন, ভাষা নেই কথা বলার। ওঁর মুখের করুণ ছবিখানি গৌরীর অন্তরে বেদনা জাগায়। ক্লিষ্ট, পীড়িত শিশু জ্বরের মধ্যে চীৎকার করে—"বাবা, বাবা," করুণ আর্ত সে চীৎকার। গৌরী চম্কে ওঠে ভয়ে, পাছে কেউ শুনতে পায়, দেবীদা চম্কে ওঠেন লজ্জায়, অন্তরে শিশুর পিতা বেদনায় রি রি করে ওঠে। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারে না। বাতাসে পাতা নড়ে ওরা চমকে ওঠে।

গৌরী ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে ভাঙ্গা গলায় বলে—'আপনি যান, কেউ আস্চে বোধ হয়।'

'তা আসুক'—সহজভাবে দেবীদা বলেন।

গভীর রাত। সমস্ত বাড়ীটা থম থম করছে। চোরের মত ভয়ে ভয়ে দু'টি প্রাণী…মা আর বাবা…তাদের পীড়িত শিশুর বিছানার পাশে বসে আছে। আবার বাতাসে পাতা নড়ে, গৌরী সকরুণভাবে বলে—'আপনি যান।'

'না না, তা হয় না'—দেবীদা উত্তর দেন।

'হাঁ, আপনি যান্। ওরা আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'তা যাক্, তাতেও আনন্দ আছে কিন্তু তবু এমনভাবে পালাতে পারিনে'—দেবীদা নির্ভীক ভাবে বল্লেন।

পাথরের মতো নিশ্চল দেবীদা আকাশ পাতাল কত কি ভাবছেন। 'দায়ী কে? শিশুর এই অসহায় অবস্থার জন্য দায়ী কে?' অনুশোচনা দেবীদার বুকে মোচড়ে দেয়। আপন মনেই প্রশ্ন করেন দেবীদা। আপন অন্তর থেকেই উত্তর আসে—'আমি। হাঁ, আমিই ত এর জন্য দায়ী।' আবার একটা তীব্র বিষাক্ত অনুশোচনা জ্বালা ধরিয়ে দেয় ওঁর অন্তরে।

'না, না, আমি নই, আমি নই, আমি হ'তে পারিনা, আমার পরিবেশ দায়ী, আমার অবস্থা দায়ী। একটা দানবীয় চাতুরী, স্বার্থান্বেষী মানুষের হীন জঘন্য চাতুরী আমাকে অসহায় করেছে। আমারি মতো কোটি কোটি মানুষকে প্রতিনিয়ত নিঙড়ে পিষে, থেঁৎলে দিচ্ছে'—ভাবতে ভাবতে দেবীদা থামলেন।

রুগ্ণ ছেলেটা বিকারের ঘোরে চীৎকার করে ওঠে—বাবা, বাবা··· টেনে টেনে কথা বল্‌ছে ও। গভীর রাতের অন্ধকারে বাইরের কিছুই দেখা যায় না—সবই স্তব্ধ ভয়াবহ। ছোট একটি কেরোসিনের আলো অস্পষ্ট ও ক্ষীণভাবে জ্বলছে। জ্বরের ঘোরে ছেলেটা আবার চীৎকার করে। বাইরে থেকে ছুটে আসে একটা এলোমেলো দম্‌কা বাতাস, ক্ষীণ আলোটা কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেলো। সমস্ত আকাশ বাতাস ঘর

বার ছেয়ে অন্ধকার কেউ কারো মুখ দেখতে পায় না। অন্ধকারে দেবীদা গৌরীর একটা হাত চেপে ধরেন আর একটা হাত দিয়ে গৌরী ছেলেটার কপালে মাথায় হাত বুলোয়। ছোট মেয়েটা ক্ষিদের জ্বালায় কেঁদে ওঠে, একটু ঠাণ্ডা জল দেয় ওর মুখে গৌরী, মেয়েটা আরো কাঁদে—ভীষণ রাতটা আরো ভীষণ হ'য়ে ওরই কান্নায় সুরে মিলিয়ে যেন আর্তনাদ করে। পাঁশুটে পাখায় ভর দিয়ে একটা রাতের পাখী ডেকে যায় ভয়ে মেয়েটা গৌরীকে চেপে ধরে। শুক্‌নো মাইটা দাঁত দিয়ে চেপে চোষ্‌তে থাকে—এক ফোঁটাও পানীয় বের হ'য়ে আসে না ওদের থেকে—গৌরীর বেদনা বোধ হয় তবু সে বাধা দেয়না। "রাত ক'টা ?"—গৌরী প্রশ্ন করে, "দাঁড়াও দেখি।" দেবীদা ওকে ছেড়ে চলে যান, বাইরে গিয়ে তারা দেখে সময় আন্দাজ করার চেষ্টা করেন, অন্ধকারে পা টিপে টিপে দেবীদা ঘরের মেঝেতে পা' দেন কিন্তু চৌকাঠের নীচেই কি যেন কিল্‌ কিল্‌ করে সরে গেল, ভয়ে আঁৎকে ওঠেন দেবীদা, পর মুহূর্ত্তেই আবার স্থির হন্‌।

"কি ?" উদ্বিগ্ন গৌরী প্রশ্ন করে।

"কিছু না বোধ হয় সাপ, ঠাণ্ডা পেয়ে পড়ে আছে।"

"আলোটা জ্বালো দেখি ! দেশলাই কোথায় ?"

চুপ করে থাকে গৌরী।

আর প্রশ্ন করেন না দেবীদা। তিনি ত সবই জানেন এ বাড়ীর অবস্থা। আশ্বাসের স্বরে বলেন—"ভয় পেওনা ওকে ঘাঁট্‌কে লাভ নেই। খোকার জ্বরটা কিছু কম মনে হচ্ছে ?"

"কিছু বোঝা যায় নি। গা'টা খুব গরম। মাথাটা চাল্‌ছে বোধ হয় মাথায় খুব বেদনা হচ্ছে।"

রাত শেষ হ'য়ে আসে। ছেলেটা বিকারের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করছে—বাইরের বাতাসে তালগাছের পাতাগুলো খড়্‌খড়্‌ করে ওঠে উদ্বিগ্ন গৌরী ব্যাকুলভাবে বলে—"আপনি যান্‌, আর আপনার থাকা চল্‌বে না" .

একটা ভাঙা দীর্ঘশ্বাস বের হ'য়ে আসে দেবীদার বুক থেকে। আর ওর থাকার অবকাশ নেই। বুকের ব্যাথা বুকে নিয়ে চোখের কোণায় এক ফোঁটা জলও না এনে ওঁকে সরে যেতে হয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি এসে পড়েন ভোলার শশা বাড়ীতে—"ভাই ভোলা, একবার বেরিয়ে আয় ত ভাঙা গলায় দেবীদা ভোলাকে ডাকেন। বিস্মিত ভোলা বের হয়ে আসে—কে দেবীবাবু, এ কি ? মুখ চোখের চেহারা এমন কেন, সারারাত ঘুমোও নি বুঝি ?"

"হ্যাঁ খোকার খুব অসুখ তাই বাড়ী গেছলাম একবার।"

—"কেমন দেখ্‌লে ?" ভোলা জিজ্ঞেস করে।

"কিছুই বুঝতে পারিনি, রাতের অন্ধকারে কিছুই টের পাইনি তাই তোর কাছে এসেছি একবার যা ত দেখে আয় কেমন আছে।—জড়িতভাবে দেবীদা কথাগুলো বলেন। আর অপেক্ষা না করেই ভোলা বেরিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি দেবীদার বাড়ী ঢোকে······তখন ভোরের আলো স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে পাখীগুলো আলোর আনন্দে চীৎকার করছে। সমস্ত বাড়ীটা

খাঁ খাঁ করছে হেথায় হোথায় দু'একটা ছেঁড়া কাঁথা বালিস পড়ে রয়েছে। সামনে ঘরের ভেতরে চোখ পড়তেই দেখ্‌লে তাতে একেবারে আঁৎকে উঠ্‌লো! দেবীদার স্ত্রী গৌরী অসাড়ে ঘুমুচ্ছে সারারাতের ক্লান্তি আর বহুদিনের অর্ধাহার আর অনাহারে ওর মুখ চোখ নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। কঙ্কালসার মেয়েটা বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুক্‌নো মাইগুলোতে মুখ দিয়ে পড়ে আছে আর তারই পাশে মরে পড়ে আছে ছেলেটা কঙ্কালের মতো শীর্ণ দেহটা অযত্ন আর অনাহারে—অনাহারে আর রোগে শুক্‌নো হ'য়ে গেছে। থেমে গেছে ওর শেষ স্পন্দনটুকু দাঁতগুলো বের হ'য়ে আছে আর তাই যেন ভেঙ্‌চি কাট্‌ছে উপহাস করছে মানুষকে উপহাস করছে অসহায় পিতৃস্নেহ আর মাতৃস্নেহকে। তারই কাছে সবার মাথার উপরে পড়ে আছে একটা বড় গোখ্‌রো সাপ—জিব দিয়ে কলসীর গড়িয়ে পড়া জলটুকু চাট্‌ছে। ভোলা খুঁজে পায় না কোন ভাষা বুঝতে পারে না সে কি জন্যে এসেছে কিই বা তাকে করতে হবে? শুধু ভাবে কি এই, দেবীদা, লোকটা কি? দেবতা না দানব, দানব না মানুষ? ওর মন চায় না ওর বৌদিকে জাগিয়ে তুল্‌তে। মন চায় না ওকে বাস্তব বেদনায় ফিরিয়ে আন্‌তে। সারারাতের যুদ্ধের পর এই সবে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়ত এখনো ঐ মায়েব মন জানে না ওর নাড়ী ছেঁড়া ধন ওকে ছেড়ে চলে গেছে বলে। স্বামীর কাজের প্রতিবাদ কোনদিন করেনি 'ও', নিজের হাজার দুঃখ লক্ষ অভাবকে অম্লান মুখে সয়ে গেছে। দেশের জন্য দুঃখ দারিদ্র

সওয়াকে দেবীদা জেনেছে অনুভব করে, দেখে আরও জেনেছে ঐ মূর্খ ভোলার মতই। দেবীদার কথা শোনে ভোলা জেনেছে দেশকে ভালবাসতে—কি তার দেশ, কেমন তা সেটুকু খবর ভোলা বড় একটা জানে না…শুধু তার দেবীদা দেশকে ভালবাসে তাই সেও ভালবাস্‌বে। গৌরী হয়ত তাই জানে দরিদ্র বাঙ্গালী ঘরের সাধারণ অশিক্ষিত মেয়ে এর বেশী আর কিই বা জানতে পারে? স্বামী অকাতরে দেশকে ভালবাসে তার জন্য দুঃখ যন্ত্রণা অপমান সয় সেও সইবে। ভোলা আর গৌরীর দেশকে ভালবাসার মধ্যে অবিশ্বাস নেই, সন্দেহ নেই, ক্ষোভ নেই। কিন্তু কি যে করে ভোলা কিছুই বুঝ্‌তে পারে না। ভীষণ সাপটা অন্ততঃ সেটাকে ত তাড়াতে হবে যদি সাপটা এদের কাকেও কামড় দেয়? তা দিক্—অভিমানের সঙ্গে ভোলা মনে করে।

দিক্ ওটা ওর বৌদিকে একটা বিষাক্ত ছোবল পরিত্রাণ পাক্ এই যন্ত্রণার থেকে। সাপের ছোবলে যে যন্ত্রণা, যে তীব্র জ্বালা তার চাইতে ঢের বেশী জ্বালা পাবে ও ছেলেটার মৃত্যুতে …এতদিনের দুঃখ কষ্ট সবই সে অকাতরে সয়েছে…কিন্তু আজকের এই যন্ত্রণা কেমন করে সইবে?

একবার ভাঙ্গা গলায় ডাকে "বৌদি ও বৌদি" তারপর ভোলা চলে যায় মহুয়া আর অমিতকে ডাক্‌তে।

আটঘণ্টা পরে ওরা সবাই ফিরে এসেছে সেই দৃশ্য, অসাড়ে ঘুমুচ্ছে গৌরী, মেয়েটা ওর বুকের উপর পড়ে শুক্‌নো মাই-

গুলো চোষ্ছে···ছেলেটা দাঁত বের করে মরে পড়ে আছে বড় সাপটা কলসীর গড়িয়ে পড়া জলটুকু চাট্ছে আঁৎকে ওঠে সবাই···সমস্ত বাড়ীটা আর এদের এই অবস্থা যেন বিদ্রূপ করছে ভেঙচি কাট্ছে পৃথিবীর আলো, বাতাস ফুল, শস্য, জ্যোৎস্না, রৌদ্রকে। এদের সকলের কলরবে সাপটা সরে যায় বৌদি ধড়মড়িয়ে ওঠে, মেয়েটা ভীষণ ভাবে চীৎকার করে ওঠে···বৌদির পোড়া মুখটা আরো কালো হ'য়ে যায় তাকিয়ে দেখেন মরে পড়ে থাকা ছেলেটাকে···দেওয়ালের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সাপটাকে, বাইরে মহুয়া, অমিত, ভোলাকে। বাইরে কট্কটে রোদ এসেছে। ঘুম থেকে উঠেই তাই বার-বার চোখ ঘষে দেখে কি এসব, স্বপ্ন, না দুঃস্বপ্ন, না সবই সত্য। শুষ্ক গৌরী চোখ দিয়ে এক ফোটা জলও গড়িয়ে পড়ে না··· ওর শুক্নো চোখে মুখে কোথাও যেন জল নেই একটা ঊষর মরুভূমির মতই ওর মাতৃ হৃদয় শুষ্ক হ'য়ে গেছে···বোধ হয় দারিদ্র, অভাব, যন্ত্রণার দাব দাহে শুকিয়ে গেছে—নীরস প্রাণহীন পাথর হয়ে গেছে। পাশে লুটিয়ে পড়ে গৌরী। ভোলা, অমিত, মহুয়া তুলে নেয় ছেলেটাকে নিঃশব্দে বের হ'য়ে যায় শ্মশানের দিকে। মেয়েটা ভীষণভাবে চীৎকার করছে···সমস্ত বাড়ী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

*　　　*　　　*　　　*

শ্মশানে গর্ত খোঁড়া হয়। ভোলা খোঁড়ে সেই গর্ত··· সবাই মিলে শুইয়ে দেয় ছেলেটাকে মাটির মধ্যে তারপর

চাপা দেয় মাটি, অনেক মাটি। কাজ শেষ করে ওরা ফিরে যায়। মহুয়া বাজার থেকে খাবার কিনে নিয়ে দেবীদার বাড়ী যায়, দেবীদার মেয়েটাকে খেতে দেয়, খাবারগুলো গিল্‌ছে 'ও'।

গৌরী জ্ঞানহীন মুখে চোখে মহুয়া জলের ঝাঁট মারে পাখার বাতাস করে কিন্তু কোন ফলই হয় না। ভোলা ফিরে গেছে ওর কুঁড়েতে···দেবীদা ঘুমিয়ে গেছেন, ঘুম আর ঘোরের মধ্যে ডুবে আছেন। ভোলা কাছে গেলে চমকে ওঠেন দেবীদা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন, কিছুই বল্‌তে পারেন না দেবীদা, ভোলাও পারে না কিছু বল্‌তে। অনেক পরে ভোলা ভাঙা গলায় বলে—"দেবীবাবু কিছু খাবে ?"

"কি খাব, কি দিবি তুই ?"

আস্তে আস্তে চলে যায় ভোলা। কিছু পরে খানিকটে দুধ আর কিছু ফল নিয়ে ফিরে আসে। দেবীদা এগুলো খান তারপর দুধটুকু পান করে সুস্থির হন। সমস্ত দিনটা স্তব্ধতা ঘুম আর ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। ধীরে ধীরে আকাশের আলো মিলিয়ে আসে পাখীদের কলরবে গাছগুলো মুখর হয়···ঝিঁ ঝিঁরা একটানা ডেকে চলে আকাশে তারা দীপগুলো জ্বলে ওঠে সারে সারে কাতারে কাতারে···আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে দেবীদা ভোলার কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে যান শ্মশানের দিকে নিজেরই পায়ের শব্দে নিজেই চমকে ওঠেন···নিজেরই নিশ্বাস প্রশ্বাসে মনে হয় কে যেন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে। পাঁশুটে পাখায় ভর দিয়ে একটা রাতের পাখী ডাক দিয়ে যায় চ্যাঁক

চ্যাক করে। দেবীদার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে বসে পড়েন তিনি একটা মাটির ঢিবির উপর, দমকা বাতাসে শূন্য কলসী-গুলো সোঁ সোঁ করে ওঠে। কিছু দূরে একদল শেয়ালের মাটি খোঁড়ার শব্দ, তেড়ে যান দেবীদা ওদের—ওরা সরে যায় আবার একটা এলো মেলো দমকা বাতাস ধূলোবালি উড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠে কাছের তালগাছের শুক্‌নো পাতাগুলো খড়খড়িয়ে ওঠে, দেবীদা বসে পড়েন। আবার শেয়ালগুলোর উল্লসিত চীৎকার মাটি খোঁড়ার শব্দ—এবার দেবীদা নীরব কোন বাধা দেওয়ার ইচ্ছা নেই ওঁর। শেয়ালগুলো মাটি খুঁড়ে বের করে একটা রুগ্‌ণ শিশুর দেহ—রুগ্‌ণ শুক্‌নো কঙ্কালের মতো রক্তহীন মাংসহীন—ওটাকে নিয়ে শেয়ালগুলোর মধ্যে কাড়া-কাড়ি পড়ে যায়—নাড়িভুড়িগুলো নিয়ে টানাটানি করে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন দেবীদা—একটা কঙ্কাল—ত্ু'এক টুক্‌রো নাড়ীভুড়ি—রক্তের ছিটে ফোঁটা—এক আধটা জায়গায় মাংসের এক আধ টু লেগে থাকা। বোঁ বোঁ করে ধূলোবালি উড়িয়ে কলসীগুলোকে সোঁ সোঁ করিয়ে ত্বরন্ত বাতাস বয়ে যায়।

দেবীদার মাথাটা ঝিম্ ঝিম করে। উঠতে চেষ্টা করেন পারেন না—চোখের চারদিকে আলো মিলিয়ে যায়—দেবীদা ব্যাকুলভাবে ছুটোছুটি করচেন—খোকা বাবা আমার, খোকা আমার—করুণ আর্ত সেই চীৎকার চরের সমস্ত স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে যন্ত্রণায় হা-হা-করে ওঠে। বেহুঁসের মতো দেবীদা কেবল ছুটচেন। এর মধ্যে চার পাঁচজন সেপাই সান্ত্রী ওঁকে ঘিরে

ফেলেছে—সে খেয়াল ছিল না ওঁর। ওদের একজন গম্ভীরভাবে বল্লে—দেবীবাবু আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে আপনাকে এরেষ্ট করা হ'বে।

চমকে ওঠেন দেবীদা, অন্য সময় হ'লে পিস্তলের গুলী ছুঁড়ে পথ কেটে বার হ'য়ে যেতেন কিন্তু আজ আর ওঁর সে ইচ্ছে নেই। তাই শান্ত ভাঙা গলায় বলেন—"এরেষ্ট চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন,—সুযোগ নিয়েছেন আপনারা ধন্য আপনাদের।

হো-হো-করে হেসে উঠ্‌লো ওরা, পৈশাচিক হাসি কিছুক্ষণ আগে কঙ্কালসার মড়াটাকে নিয়ে শিয়ালগুলোর যে উল্লাস জেগেছিল কতকটা তারই মতো। ওরা তখন দেবীদার হাতে হাতকড়া আর কোমরে দড়ি দিয়েছে "চলুন দেবীবাবু থানায় চলুন"—ওদের একজন বল্লে।

কেন, সার্চ কর্বেন না, আমার বাড়ী যাবেন না? প্রশ্ন করলেন দেবীদা আশা করেন গৌরীকে একবার দেখে যাবেন কিন্তু আবার ভাবেন—'কেন, কিসের তাঁর অধিকার? মন্ত্র চালিতের মতো দেবীদা ওদের পিছু পিছু চলতে থাকেন। থানায় ষ্টেট্‌মেণ্ট দেওয়া হয়, তারপর ওঁকে আটকে রাখা হয় একটা অন্ধকার সেলে—এইটেই থানার হাজত—অসংখ্য মশা, ছারপোকা, আরসোলার বাসস্থান ওদের কামড় আর মুতের ঝাঁঝালো বিশ্রী গন্ধ—নরকের মতো কদর্য ও বিশ্রী এরই মধ্যে ওঁর খাবার পৌঁছে দেওয়া হয় দু'এক গ্রাস খেয়ে দূরে ঠেলে দেন খাবারগুলো। ওঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে···একটা কঙ্কাল

রুগ্‌ণ শুঁক্‌নো রক্তহীন বুকের ভেতরে মোচড় দেয় একটা দীর্ঘশ্বাস ……রাত ৩টার ট্রেনে ওঁকে এসকর্টের অধীনে ষ্টেশনে আনা হয় স্তব্ধ দেবীদা ওঁর চোখে এক বিন্দু জল নেই কঠিন ইস্পাতের মতো চোয়াল দু'টো, কপালটা সাদা পাথরের মতো, মুখখানা শান্ত গম্ভীর চোখ দু'টো কালো ও মলিন। লোকারণ্য প্ল্যাটফর্মের উপর পাথরের মত বসে আছেন দেবীদা পাশে সশস্ত্র প্রহরী দু'জন···কতলোক চলাফেরা করছে এদেশ হ'তে ওদেশ, এ গ্রাম হ'তে ও গ্রাম, গ্রাম হ'তে সহরে, সহর হ'তে গ্রামে।

ট্রেন আসার আর বিলম্ব নেই। দেবীদা দেখেন—পাগলের মতো একটা মেয়ে ছুটে ছুটে আস্‌চে আর পিছনে পিছনে কে নিষেধ করতে করতে চলেছে। কেও? কেও?—ওযে গৌরী আর ওরই পিছনে মহুয়া। শুষ্ক কাঠের মত ফ্যাকাশে গৌরীর মুখ খানা—ছুটে আসে গৌরী দেবীদার পায়ের তলায় আছাড় খেয়ে পড়ে—"ওগো আমায় কোথায় রেখে চল্‌লে!" হো-হো-করে হেসে ওঠে সেপায়ের দল। দেবীদা পাথর পাথর নড়ে দেবীদা নড়েন না। মহুয়া স্তব্ধ হয়ে যায় কে এই দেবীদা মানুষ না দেবতা, দেবতা না দানব কি, কি এই দেবীদা? ট্রেন আসে গৌরী চোখের জল ফেল্‌ছে দেবীদার পায়ের নীচে অসহায় সে কান্না। সেপায়ের দল গম্ভীরভাবে বলে—ওঠো তুমি ওঠো, যাও বাড়ী যাও।" দেবীদা ইসারায় মহুয়াকে বলেন—তোর বৌদিকে বাড়ী নিয়ে যা তারপর বন্দেমাতরম্‌

বলে ট্রেনের কামরায় চেপে বস্‌লেন। একটু পরে ট্রেনের হুইশিল বাজ্‌লো—হু হু করে ছুটে চল্‌লো ট্রেনখানা। সেই একটু আগের জনাকীর্ণ প্লাটফর্ম শূন্য হ'য়ে গেলো—এক-প্রান্তে ধূলোর উপর গৌরী জ্ঞানহীন পড়ে রয়েছে আর মহুয়া পাশে বসে আছে ভাবছে আকাশ পাতাল কত কি, ধন্য এই দেবীদা দেশের স্বাধীনতার জন্য' আজাদীর জন্য সর্বস্ব দিয়ে এই মুক্তিসাধক এগিয়ে গেলেন। অনেক পরে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস যখন জোরে বইছে তারই ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় গৌরীর জ্ঞান হয়। মহুয়া ডাকে—বৌদি।

অস্ফুট ভাঙা গলায় বৌদি উত্তর দেয়—"কি ভাই।"

"বৌদি চল বাড়ী যাই"।

চল্, ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে গৌরী উঠে দাঁড়ায়, ঘরে ফিরে আসে ওরা।

এর পর কি হ'বে বৌদি? মহুয়া প্রশ্ন করলো।

কিসের ভাই, কাজের দেশের কাজের ভার এখন আমাদেরই নিতে হবে।

পারবে তুমি, আর কেউ নেই, পারবে তুমি? উৎকণ্ঠিত মহুয়া প্রশ্ন করে।

কেন পার্বোনি ভাই, এত পেরেছি, ছেলেকে মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়েছি তিলে তিলে শুকিয়ে মেরেছি···রোগে একটু ওষুধ, একটু পত্তি দিতে পারিনি···তাও পেরেছি এত সইতে পেরেছি, স্বামীকে জেলের মুখে যেতে দিয়েও ভেঙে পড়িনি যেখানে

সেখানে পার্বোনি কেন, আর তা ছাড়া ওঁর অসম্পূর্ণ কাজ আমরাইত কর্বো ভাই।

মহুয়ার মুখে আনন্দের হাসি ফোটে, চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে···কে বলে মুক্তি অসম্ভব কে বলে স্বাধীনতা নিছক স্বপ্নবিলাস? বাংলার ঘরে ঘরে ভারতের ঘরে ঘরে এমন গৌরী আছে—এমন দেবীদা আছে—স্বাধীনতার মূল্য কি এত বেশী যে তা এত বড় ত্যাগ দিয়েও কেনা যাবে না? যে আগুন একটা অন্তরে জ্বলছে অনির্বাণ ভাবে তা কি ছড়িয়ে পড়বে না? ভাবতে ভাবতে মহুয়া তন্ময় হ'য়ে যায়। কাজ আমাদের করতে হ'বে। জীবন বিপন্ন করেও দেশকে মুক্ত করতে হ'বে ভাই, এই দেশের অসংখ্য অশিক্ষিত, দুঃস্থ, দীন দরিদ্র, দুর্বল মানুষকে জাগাতে হবে···ওদের একত্র কর···স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে যেতে হ'বে। আমাদের শুধু কি একটা স্বাধীনতা পেলেই চলবে ভাই, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক বহু বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হ'বে ভাই।

বৌদি থামলেন।—আমাদের আষ্টে পৃষ্ঠে যে সব বাঁধন রয়েছে যা আমাদের দেশকে পঙ্গু জড় করে ফেলেছে তার থেকে একে মুক্ত করতেই হ'বে।

একটা পুবালি বাতাসের মতো বৌদির ঠাণ্ডা মিষ্টি কথাগুলো মহুয়ার মন থেকে সব অবসাদ দূর করে দিলে যেন। আর কোন দ্বিধা নেই, দুঃখ নেই, অবসাদ নেই···নূতন বল, নূতন নূতন চালক, নূতন আলো সামনে রয়েছে এগিয়ে চল,। এতো

অল্পে মুষড়ে পড়লে চল্‌বে কেন, কাঁদবার বা দীর্ঘশ্বাস ফেল-বার সময় কৈ, এগিয়ে যেতে হবে। মহুয়া ভাবতে ভাবতে অবাক্ হয় এই বৌদি যে একটু আগে উন্মাদের মতো স্বামীর জন্য ছুটে চলেছিল যে একটু আগে অসহায়ের মতো চোখের জল ফেলছিল সে এত শক্ত, অবাক হ'য়ে যায় মহুয়া যতভাবে তত বেশী অবাক হয়ে যায়।

*　　*　　*　　*

কাহার পাড়ার মজলিস্ বসে। অসংখ্য কাহার সমবেত হ'য়েছে পচাই, পুন্ন, করালী, হ্যাম, জ্ঞেনা, পরেশ, এরা সবাই এক এক গাঁয়ের মাতাব্বর। মদ ছাড়তে হবে···মায়ের আদেশ। গৌরীকে' দেশের ইতর লোক সবাই মা বলে। কিন্তু ছাড়তে কি পার্বে ওরা, ওদের দেহের শিরায় শিরায়, হাড়ে হাড়ে রক্তের অণুতে অণুতে যে নেশার আবেশ ছড়ান আছে যা ওদের দেহের ও মনের উপরে নীলকণ্ঠের তন্দ্রালুতা এনেছে তা কেমন করে ছাড়্‌বে? মহুয়া আর গৌরী সভায় উপস্থিত হয়। মহুয়া ওদের উদ্দেশ করে বলে—"ভাইগণ। তোমরা ত জান তোমাদের জীবন—ভাল করেই জান তোমাদের দুঃখ কষ্ট তোমরা আসলে যে জীবন যাপন কর তা কি মানুষের না তা পশুর? চিরকাল অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে এসেচ আর সয়ে গেছ সমস্ত ঝড় জল রোদ মাথার উপর গায়ের উপর কিন্তু ভেবে দেখো সত্যই কি তোরা মানুষ নও, তোমাদের কি সাধারণ ভাবে ভালো জীবনযাপন করার কোন অধিকার নেই, নেই

কি তোমাদের কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের বাসনা? সবই অদৃষ্ট নয়, সবই দ্যাবতার কোপ নয়, সবই ঠাকুরের কাছে অপরাধ নয়···তোমরা নিজেদের বুঝতে শেখ, বাঁচার অধিকার তোমাদের আছে, সে অধিকারের দাবীও তোমরা করতে পার, তা সম্পূর্ণভাবে সঙ্গত, কোন অন্যায় হবে না তাতে।

কাহাররা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ী করে, ওরা যেন স্বপ্ন দেখছে। বদ্ধ আলোহীন ঘরে আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে অন্ধকারের জীবকে···পুরানো ভিতে পচা সংস্কারের মধ্যে ভূমিকম্পের দোলা লাগে।

মহুয়া আবার আরম্ভ করে—"দেবীবাবুকে তোমরা সবাই জান্‌তে, আজ তিনি জেলে···হরিহরপুরের লুটের অপরাধে তাঁকে জেলে পাঠানো হ'য়েছে···কিন্তু সেত তোমাদেরই জন্যে। দুর্ভিক্ষ এসেছে, তোমরা অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে বেড়াল কুকুরের মতো মরেছ, কেউ তোমাদের দিকে তাকায় নি···কেউ তোমাদের এক মুঠো খেতে দেয়নি···কিন্তু এই যে নীরবে মুখ বুজে সয়ে গেছ কি পেয়েছ তার পরিবর্তে? কিছুই পাওনি, আজ তাই তোমরা চেষ্টা কর···প্রতিজ্ঞা কর বাঁচার অধিকার তোমরা আদায় কর্বে, মদ তোমরা ছাড়বে···অন্ধ বিশ্বাস করে নিজেদের ক্ষতি কর্বে না। কপাল নয়, কপাল করেই কাহার কুলে জন্ম হয় না, আর কপাল গুণে যদি বা জন্ম হয় কিন্তু খেতে না পাওয়া পরতে না পাওয়াটা কপাল গুণে নয় সেটার জন্য তোমরা নিজেরাই দায়ী, তোমাদের চোখের সাম্‌নে ভদ্রলোক বলে যারা পরিচয় দেয় তারা

বেশ আছে···তোমাদের খাটিয়ে তারা তাদের সব প্রয়োজনীয় সংগ্রহ করে···তাদের চাষে তোমরা খাট, উৎপন্ন নিয়ে যায় তারা···তাদের ঘরবাড়ী তোমরা মেরামত কর কিন্তু তোমাদের মাথা গোঁজবার সামান্য একটু জায়গা নেই··· তাই বুঝে নেবার দিন এসেছে···তোমাদের মাথা তুলে জাগতে হ'বে, মেয়েদের ইজ্জত বজায় করতে হবে, সামাজিক পরিবর্তনও আন্‌তে হবে।" মহুয়া আবার থাম্‌লো।

কাহার পাড়ার যুবকরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ওর মুখের পানে তাকায়—একি, এও কি সম্ভব! দু'একটা চেনকা ছোঁড়ার মন আনন্দে আর উত্তেজনায় টগ্‌বগিয়ে ওঠে, মেয়েরা খুসীতে ভরে ওঠে। মহুয়া জোর গলায় বলে—"বল তোমরা মদ ছাড়বে, মদ না ছাড়লে তোমরা কিছুই বুঝতে পার্বে না···নেশায় মশগুল হ'য়ে থাকলে চল্‌বে না···বাঁচতে হবে বাঁচার মতো বাঁচা—" সমবেত জনতার কানে কানে ঐ একটা কথা পাক খেয়ে খেয়ে মর্মে মর্মে ঢুকলো—"বাঁচতে হ'বে—বাঁচার মতো বাঁচা।" দিনে দিনে মজলিস্ বসে—ডোম পাড়ায়, বাগ্দী পাড়ায়, লোহার পাড়ায়, সাঁওতাল পাড়ায়। ঘুমন্ত মানুষ জাগে···একটা নূতন স্বপ্ন ওদের চোখে, বাঁচতে হবে—ঐ পাশে ভদ্দর লোকদের মতো, অধিকার পেতে হবে—ঐ মনিবদের মতো···এতদিন যে তফাৎকে ওরা মেনে নিয়েছিল আজ তা মিলে আস্‌তে চায়।

গৌরী আর মহুয়া বসে বসে গল্প করছে, এলোমেলো গল্প···রতন এসে দাঁড়ালো। গৌরীর পা ছুঁয়ে প্রণাম

করে দাঁড়ালো রতন, "কি হুকুম আছে মায়ী?" করলে রতন।

"হুকুম আর কি বাবা, হুকুম কিছু নেই, হুকুম তোমরাই কর্বে—সব ভারই আমি তোমাদের হাতে দিয়েছি"—বৌদি ধীরে ধীরে কথাগুলো বল্লেন। তোমাদের ভালো তোমাদেরই করতে হবে—তোমার গাঁয়ের লোকদের মদ খাওয়া বন্ধ করগে। বাবা, সামান্য কি-ই বা মজুরী পায় তারা, তাও যদি মদ খেয়ে উড়ে যায় তবে কেমন করে দুটো খেতে পাবে বল? ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলেন বৌদি।

হাঁ মা, তোমার পা ছুঁয়ে দিব্য কর্ছি, ভৈরবের নাম নিয়ে দিব্য গাল্ছি ওদের আর মদ খেতে দেবো না। মহুয়া অবাক্ হয়ে যায়। রতনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে—বহুদিনের গুণ্ডা, দাগী, খুনী রতন···বহুদিন থেকেই মহুয়া এঁকে দেখেছে—কালো পাহাড়ের মতো বিরাট চেহারা···চোখ দু'টো মদ খেয়ে টক্‌টকে জবাফুলের মতো রাঙা, মুখে একটা হিংস্র শ্বাপদের লুব্ধতা···ওকে দেখ্‌লেই কেমন যেন ভয় করে। সামান্য দু'চারটে টাকার জন্য কতবার কত নিরীহ মানুষকে মুখে কাপড় গুঁজে মেরেছে—সেই রতন। সেই ঘৃণিত রতন দিনের আলোকে বড় একটা দেখা দেয় না···রাতের অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে মেরে সে বের হয়ে আসে রক্ত-লোলুপ বাঘের মত···যার চোখ-গুলো অন্ধকারেও জ্বল জ্বল করে জ্বলে ওঠে বুনো বিড়ালের মতো সেই রতন,—যার নাম শুন্‌লে ছেলেবেলায় গায়ে কাঁটা

দিয়ে উঠেচে—বড়রা দরজায় খিল দিয়ে ত্রাহি ত্রাহি দুর্গা নাম জপেছে, সেই রতন···জেল যার ঘর, খুন যার দিনের কাজ সেই শান্ত ধীর গলায় বৌদির পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছে "সত্যি বলছি মা, মদ কাকেও স্পর্শ করতে দেবো না।" ধীরে ধীরে আড়ষ্ট মানুষ জাগ্‌ছে, পুরানো হাজার বছরের বাতব্যাধি যা ওদের হৃতপিণ্ড, পেশী, স্নায়ু, গ্রন্থি প্রতিটি রক্ত-বিন্দুকে বিষাক্ত করে রেখেছিল, বিকল করে রেখেছিল, সেই ব্যাধি আজ সরে যাচ্ছে। যে ক্ষয় রোগ ওদের অস্থি, মজ্জা, হাড়ে ঘুণ ধরিয়েছিল, ওদের বুকের পাঁজরাগুলো ঝাঁঝরা করেছিল—কোন্ বৈদ্যুতিক স্পর্শে তার থেকে মুক্তিলাভ করছে এরা। যে কুষ্ঠ ব্যাধির মতো পচা সংস্কারগুলো ওদের দেহ-মনকে গলিয়ে পচিয়ে ধ্বসিয়ে নরকের কীটে পরিণত করেছিল তাই যেন বাইরের এক অজানা বাতাসের ছোঁওয়ায় এক হাওয়ার আস্বাদনে নির্বিষ হ'চ্ছে।

*　　*　　*　　*

সুরু হয় তে-ভাগা আন্দোলন। চাষীর দু'ভাগ, জমির মালিকের একভাগ। দিনে দিনে দানা বাঁধে এই আন্দোলন। চাষীদের পল্লীতে পল্লীতে গোপন ও প্রকাশ্য মজলিস্ বসে—ডোম, হাড়ি, বাউরী, বাগ্দী, লোহার, খয়রা, সাঁওতাল, মাঝি সকল রকম জাতের মধ্যে···সাড়া পড়ে গেছে জাগরণের সাড়া। কল্ কল্ ছল্ ছল্ করে পাহাড়ের বুনো ঝর্ণা যেন ঝর্ ঝর্ করে নেমে আস্‌ছে সমতলের ক্ষেত্রে আলোর

সংস্পর্শে। জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মনিবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এতদিন যাদের পাতের উচ্ছিষ্ট পেসাদ পেয়ে ধন্য হ'য়েছে ওরা, যাদের এক টুক্‌রা জমি আগ্‌লাতে গিয়ে নিজেদের তাজা মাথাটা দিয়েছে···একটা বাহবা, এক টুক্‌রো কথার জন্য অকাতরে অম্লান মুখে দুঃখ সয়ে গেছে সেই তাদের বিরুদ্ধে।

বুড়োরা বারণ করে বলে—সে কি, এও কথা! তোদের মতিগতি সব নষ্ট হ'য়েছে—যাদের খেয়ে মানুষ···যাদের দয়ায় বেঁচে আছিস্‌···যাদের অর্ধেক রক্ত তোদের বুকের মধ্যে তাদের মাথায় বাড়ি, ধর্ম গেলো, কলিযুগে কি ধর্ম আছে—নরকে যাবি তোরা—অধঃপাতে যাবি···গুয়ের পোকা হ'য়ে সাত জন্ম ঘুরবি··· ভ্যাবতা কি নেই? দিন আত্তির নেই, কিছু কি নেই?···বাবা ভৈরব, বাবা কালরুদ্দুর, বাবা বড়ম এরা কি সইবেন? দেখেনিস্‌ পাপের পথে শালারা ভরাডুবি হবি···জেহান্নামে যাবি···।

বুড়ীরা চোখের জল ফেল্‌ছে—হেই বাবা ঠাকুর—সুমতি দাও ছোক্‌রাদের সুমতি দাও,···যাদের খেয়ে মানুষ তাদের মাথায় লাঠির বাড়ি এও সইবে মা বছুন্ধরা···মা পিথ্যিবী। ছোক্‌রারা অটল। ওরা দেবে না ওদের উৎপন্ন শস্যের অন্যায় ভাগ, দেবে না দাদন-নেওয়া ধানের বাড়ের বাড় তস্য বাড়···ধার করা টাকার সুদের সুদ তস্য সুদ···তার জন্যে লাঠি ধর্‌বে ওরা, বাড়ি মার্‌বে ওদের ঐ পুরানো মনিবদের মাথায়। বাঁচতে চায় ওরা বাঁচার মতো বাঁচা। মদের নেশায় একদিন যারা মাতাল হ'য়ে উঠেছিল আজ তারা অধিকারের নেশায় মাতাল হয়;

ওদের সাম্‌নে নূতন দিনের আলো বেজেছে, ওরা তাই জাগছে।

জমিদারের মুখ শুকিয়ে যায়, চিন্তায় চিন্তায় বিবর্ণ হ'য়ে যায় ওদের মুখ চোখের দীপ্তিগুলো। নায়েবদের মাথার উপর চিন্তার রাশ নেমে আসে—রাশি রাশি কালো, ধোঁয়াটে, অন্ধকার মেঘগুলোর মতো। কিন্তু একি বিদ্যুৎ দীপ্তির মতো একটি কুটীল আলো দেখা দিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো···ভয়াবহ সেই আলো অন্ধকারকে আরও অন্ধকার করে তুল্‌লো যেন। একটা কুটীল অভিসন্ধি সক্রিয় হ'য়ে উঠতে লাগ্‌লো।

গভীর রাতের কোলে ঘুমিয়ে পড়ছে গ্রামগুলি নিসাড় নিস্পন্দভাবে। হতচেতনার মধ্যে সমস্তই চুপ হ'য়ে গেছে, মায়ের কোলে মাথা রেখে শান্ত শিশু চোখ বুজেছে যেন, কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, আক্রোশ নেই। সহসা একি? এক ঝলক আগুনের লাল আলো বাজ্‌লো আকাশে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাশি রাশি মেঘের মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো পাক খেয়ে খেয়ে আকাশে উঠলো—হিংসার আগুন ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠলো, শান্ত নিরীহ মানুষের সর্বগ্রাসী সে আগুন—আর্ত মানুষের চেঁচামেচি—ছুটোছুটি···জল—জল আনো, ব্যথাতুরের বিলাপ—বাবা রক্ষা কর, অগ্নি দ্যাবতা, বাবা ভৈরব, রক্ষা কর, রক্ষা কর—বাবা বাঁচাও, বাঁচাও বাবা, কিন্তু হিংসার আগুন সহজে নিভে না; সমস্ত পৃথিবী যে আগুনে পুড়ে গেছে, অফুরন্ত শস্যসম্ভার পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে—তা নেভে না। জল আনো, জল আনো—আর্ত

মানুষের চীৎকার, বাঁচাও, বাঁচাও, কিন্তু কে বাঁচাবে এদের? লোভের আগুন আজও অনির্বাণ জ্বল্‌ছে দাউ দাউ করে, সমুদ্রের জলেও এ আগুন নেভে না—সাত সমুদ্র ছিঁচেও এর থেকে রেহাই নেই। পুড়ে গেল ডোম পাড়া, কাহার পাড়া, বাগ্দী পাড়া··· লোহারপাড়া, মাঝি পাড়া। সামান্য দু'একটা পুঁজিও যাদের নেই তাদের ঐ সামান্যমাত্র কুঁড়েগুলো—মাথা গোঁজার জায়গাটুকু—তাও গেলো। পারবে কেন, শক্তিশালীর সঙ্গে দুর্বলের লড়ায়ে দুর্বলই ত হার্‌বে, এত অতি সাধারণ সত্য। পথে দাঁড়ালো অগণিত মানুষ, সর্বহারা দুঃস্থ মানুষ—সামান্য দু'একটা হাঁড়ি-কুড়ি, এক-আধটা থালা—এক-আধটা তাদের হাতে-বোনা তাল বা খেজুরের চাটাই বাঁচিয়েছে ওরা। পথ চলেছে দলে দলে, গাছের তলায় আশ্রয় নেবে বলে, বনের গাছের পাশে পাশে পাতার কুঁড়ে বাঁধে ওরা, আবার পাশাপাশি বাস করে—ডোম, মুচি, হাড়ি, বাউরী, বাগ্দী, মেটে, খয়রা। ঘর বাঁধা সহজ কিন্তু পেট চালানো সহজ নয়, কি খাবে ওরা? সামান্য সঞ্চয় এক আধ হাঁড়ি খুদ তাও গেছে। পেটের আগুন ধক্ ধক্ করেই জ্বলে ওঠে—হিংসার আগুনের চেয়ে আরও ভয়াবহ। পেটের বুকের শূন্যতায় মোচড় দিয়ে দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ওঠে সে জ্বলন্ত আগুন, পাঁজরাগুলো ঝাঁজরা করে দেয়···নাড়ি-ভুড়িগুলোকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে মারে। তাগ্‌ড়া জোয়ানগুলোও বিবশ হ'য়ে যায়, ছেলেমেয়েদের ত কথাই নেই। পরস্পরকে গাল দেওয়ার ক্ষমতা নেই—মুখের আঠা চট্‌চটে হ'য়ে বসে গেছে···

তালু শুকিয়ে গেছে, গলা কাঠ হ'য়ে গেছে...কি উপায়? গাছের কচি ফল, কচি পাতা খাচ্ছে ওরা—আর জল অফুরন্ত জল, পেট পুরে পুরে একবার দু'বার বহুবার...তবু নেভে না এ আগুন। বেলা যতই বাড়ে ততই বেড়ে যায় এ আগুন, বিনা ঝড়েই দ্বিগুণ হ'য়ে বাড়ে। বেলা পড়ে আরও বাড়ছে—আরো আরো—ক্ষেপে ওঠে ওরা—এ ওর দিকে ছুটে যায়...কাতর বিবর্ণ মুখচোখগুলো—খাবার চাই খাবার চাই...ঘাস, পাতা, জল, খেয়েই দিন শেষ হয়, আলো মিলিয়ে আস্‌চে অন্ধকারের কোলে। অশান্ত শিশুর কলরব মাতৃবক্ষে ঘুমিয়ে পড়ে নীরব হ'য়ে গেলো যেন। রাতের অন্ধকারে তারাগুলো মিট্‌ মিট্‌ করে জ্বলে। সর্বহারাদের বিপ্লব আগুন মিট্‌ মিট্‌ করছে এমনি তরো। রাতের অন্ধকারে আবার ওরা সমবেত হয়...আবার ষড়যন্ত্র করে অধিকার লাভের সামান্য এক মুঠো ভাতের জন্যে, এক টুক্‌রো রুটির জন্যে, এক মুঠো চালের জন্যে।

রতন, ভোলা, পরেশ, গতি, হেম, বাবুলাল, আশু, বাগা, ফটকা, মহুয়া সবারই এক ভাবনা—এরা ভাবে এক মুঠো চালের কথা। হায়, মানুষের বিধান! এরা—হাঁ এরাই ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্য উৎপন্ন করে। বর্ষার জল যখন দেবতার আশীষের মত আকাশ থেকে ঝরে পড়ে তখন এরাই বুনে হাজার হাজার মানুষের বাঁচার ফসল...ধান, গম, যব, রবিশস্য। ওদেরই হাতে লাঙলের বোঁটা চলে, মাটির ভিজে বুক নরম হ'য়ে পড়ে, আর তারি মাঝে ওরাই পোঁতে বীজ। তারপর

সবুজ হয় মাঠ ধানের চারায়, সোনালী হয় মাঠ গমের ফসলে। ...হাজার হাজার মণ ধান, গম, যব, যারা নিজের হাতে লাগিয়ে নিজের হাতে তুলেছে তাদের ঘরেই আজ এক মুঠা খাবার নেই—হা অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট না মানুষের বিধান, ধূর্ত মানুষের শয়তানী। সরল সহজ বিশ্বাসী মানুষ এরা, জানে না কপটতা কি, শঠতা কি—জানে শুধু খেটে যেতে, জানে উৎপন্ন করতে, কিন্তু এই এদের পরিণাম। ক্ষেপে ওঠে এরা...ক্ষমাহীন কালরুদ্রের মতো, ঝড়ো ভৈরবের মতো,—প্রেতের মতো ভয়াবহ বীভৎস অশ্লীল ও কুৎসিত, মুখোস নেই আজ এদের...ওরা লণ্ডভণ্ড কর্বে, লুট কর্বে চালের ধানের গুদাম, কেড়ে নেবে ওদের আপন অধিকার। ক্ষেপে ওঠে কুণ্ঠাহীন শঙ্কাহীন লজ্জাহীন মানুষের দল। গভীর রাতের অন্ধকারে ওরা সজ্জিত হয়—বল্লম, টাঙ্গি, বর্শা, তীর, ধনু, লাঠি, মাদল, লাগ্‌ড়া—ডু-ডুম্ ডু-ডুম্ ডুম্ ডুম্ সমস্ত বনভূমিকে মুখর করে লাগ্‌ড়া বাজলো ওদের—অন্ধকারে সভ্যতার মুখোস শ্লথ হ'য়ে পড়লো...ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেলো অভিজাত মানুষের মুখ। দিগ্‌বিদিগ্ আলোড়িত করে লাগ্‌ড়া বাজ্‌ছে—ডু-ডুম্ ডু-ডুম্ ডুম্ ডুম্, ঢাক বাজ্‌ছে—ড্যাং ড্যাং ড্যাংগাটি ড্যাংগাটি ড্যাডাং ড্যাং ড্যাং—প্রতিহিংসার নয়, অধিকারের দাবী জানাবার আহ্বানে ক্ষুধিত মানুষ নগণ্য ক্লিষ্ট উলুখড় জেগে উঠেছে। প্রতিরোধের আয়োজন হ'য়েছে, পুলিশও সমবেত হয়েছে—বন্দুকধারী ও সশস্ত্র।

প্রতিরোধ করতে হ'বে ওদের। এগিয়ে আসে উন্মত্ত

জনতা দুর্বার জলপ্রবাহের মতো—লাগ্ড়া বাজিয়ে বাজিয়ে—ডু-ডুম্ ডু-ডুম্ ডুম্ ডুম্···ড্যাং ড্যাং ড্যাংগাটি ড্যাংগাটি ডেডেং ডেডেং ড্যাং ড্যাং···গাজনের বাজনা···তিরিশে চৈতের আগুন সন্ন্যাসের বাজনা।

ভোরের শুক্ পথ দেখায় ওদের—ওরা এগিয়ে আস্‌চে, নীরবে নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ ওর মৃত্যুবাণ নিয়ে ক্ষুধার্ত্ত মানুষের ক্ষুধার শেষ নিবৃত্তির জন্যে। ভোরের আবছা আলো দেখা দিয়েছে আকাশের বুকে—লাল সে আলো—রক্তের মতো লাল, শালের বনে পড়েছে সেই আলোর আভা, ঝলমল করে উঠ্‌ছে শালের পাতাগুলো, ফুলগুলো। এগিয়ে চলেছে জনতা—আক্রমণ করলো ওরা একটা চালের গুদাম···গাজনে মেতে উঠ্‌লো ক্ষুধার্ত প্রেতের দল—বুভুক্ষু মানুষের অশান্ত ক্ষেপাদল ···লাগ্ড়া বাজ্‌ছে ডু-ডুম্ ডু-ডুম্ ডুম্ ডুম্, ঢাক বাজ্‌ছে ড্যাং ড্যাং ড্যাংগাটি ড্যাংগাটি ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাং, মাদল বাজ্‌ছে থৈয়া, থৈয়া, তা থৈয়া, তা থৈয়া, তা—তা, থৈয়া—থৈয়া, থৈয়া, তা—তা থৈয়া। শ্মশান তাণ্ডবে মত্ত প্রেতদল আগুন সন্ন্যাসে মত্ত ওরা···পুলিশের গুলী চল্‌লো গুড়ুম গুড়ুম গুম্ গুম্—ওদের তীর, বর্শা ছুটে এলো শাঁ শাঁ শন্ শন্ শন্—লাগ্ড়া বাজলো ডু-ডুম্ ডু-ডুম্ ডুম্ ডুম্···। আগুনের টক্‌টকে লাল অঙ্গারগুলোর উপর তাণ্ডব চলেছে···কালরুদ্দুর কালভৈরব, কোপের ধম্মরাজ জেগেছে, ভয় নেই ভয় নেই···। দুপুরের কাছাকাছি শেষ হ'লো এই তাণ্ডব···নষ্ট হ'য়েছে অনেক

জীবন, বুভুক্ষু মানুষের ক্ষেপাদল নিঃশেষে রক্ত দান করছে কালরুদ্দুরের আহ্বানে—বাবা ভৈরবের গাজনে আগুন সন্ন্যাস করেছে ওরা। ···বাবার পাটা মাথায় নিয়ে পাট ভক্তে নেচেছে মহাপ্রলয়ে। মরেছে রতন, পরেশ, হেম, গতি, মেথরা আরো অনেকে।···পুলিশও মরেছে, সঙ্গত দাবীকে দাবিয়ে রাখতে যাওয়ার চেষ্টায় মরেছে ওদেরও ক-জনা, গঙ্গার হুড়পা বানে ঐরাবৎ কাবু হ'য়ে গেছে। রতন—খুনী, দাগী চোর রতন··· লোহার সাবলের মত যার হাত দু'টো, সমস্ত শরীরটা যার পেটা লোহার মতই শক্ত···হিংস্র শ্বাপদের মতো যার চোখগুলো ভয়াবহ সেও মরেছে। ওর কপালে একটা গুলী বিঁধেছে···রক্ত টসিয়ে টসিয়ে পড়েছে, আর তাই ও জিব দিয়ে চেটে চেটে খেয়েছে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত,···যুদ্ধের সময় খাবারের অভাবে যখন ওর নাড়িভুড়িগুলো চুঁয়ে চুঁয়ে যাচ্ছিল, পিপাসায় যখন ওর ছাতি শুকিয়ে যাচ্ছিল···মুখের আঠা বেটে বেটে চট্-চটে হ'য়ে হ'য়ে যখন গলায় কাঠ হ'য়ে বসে যাচ্ছিল তখনই ও ওর নিজেরই তাজা রক্তের ঢেউ জিব দিয়ে চেটে চেটে খেয়েছে —আর লড়েছে অধিকারের দাবী নিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে পর্যন্ত। এক হাতে ওর এখনো একটা তীর ধরা আছে, আর এক হাতে একটা শালের গাছকে ধরে রয়েছে। শেষ হ'য়ে গেলো মানুষের দাবীর প্রতিবাদ···চুপ হ'য়ে গেলো আন্দোলনের শেষ শক্তিটুকু—ছাই হ'য়ে গেলো সে আগুন। মহুয়া ভাবতে ভাবতে যায় ওই শুধু বেঁচে আছে, বৌদিরও খবর মিলে নাই।

মানুষের আজাদীর স্বপ্ন ব্যর্থ হ'য়ে যায়···যে দিনের আলো শাল বনের পাতায় পাতায় ঝলমল করছিল তাই বিবর্ণ ম্লান হ'য়ে গেলো। রাতের ঘন স্তব্ধ অন্ধকারে আকাশ বাতাস জল মাটি সব ঢাকা গেলো।

*　　　*　　　*　　　*

পুলিশের তির্যক দৃষ্টি এবার সোজাভাবে মহুয়ার উপর পড়লো বৈশাখের খর রোদের মতো প্রচণ্ডভাবে ঠিক তালুর উপর। সন্দেহ বশে পুলিশ মহুয়াকে 'এরেষ্ট' করে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠায়।

জেল গেট।

অগণিত সেপাই ও শান্ত্রী খাঁকি ইউনিফর্ম আর বুট জুতো পরে চলাফেরা করছে—মচ্ মচ্ মচ্—গম্ গম্ করছে জেল গেট। লোহার মোটা ফ্রেমের মোটা গরাদের জেল গেট······একটা অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠে মহুয়া। এই জেল······মানুষের স্বাধীন সত্ত্বাকে, আশা আকাঙ্ক্ষাকে নিঙড়ে পিষে থেঁৎলে ফেল্‌বে। এই জেল—এরই প্রতিটি ধূলিকণায় প্রদ্যোত, সত্যেন, কানাইলালের রক্ত মিশে আছে; মহুয়া প্রণাম করে এই জেলকে, ওর চোখ দিয়ে আবেগের অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে। গেটের পাশেই অফিস্, মহুয়াকে অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানের করণীয় কাজ শেষ হ'লে ওকে পাঠানো হয় বিশ ডিগ্রী ওয়ার্ডে। চার পাঁচটি শেল নিয়ে ওর জন্যে একটি পৃথক্ বাসস্থান করা

হ'য়েছে। ক্লান্ত মহুয়া করণীয় কাজগুলি করে ঘুমিয়ে পড়ে লোহার পালঙ্কের উপর।

দুপুরের নিষ্করুণ সূর্য মধ্যাহ্ন আকাশে ওর উত্তপ্ত চুল্লী জ্বালিয়েছে, ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে আগুনের হল্কা আকাশ থেকে মাটিতে। মহুয়ার চোখের সামনে চিরপরিচিত রাস্তা ঘাট মাঠ প্রান্তরগুলো ভেসে ওঠে। প্রাণ কাঁদে বাইরের মুক্ততার জন্যে। ওর ওয়ার্ডের বাইরে একটা নিমগাছ, ওর ডালে একটা বুল্‌বুল্‌ আনন্দে শিস্‌ দিচ্ছে—মহুয়া ভাবে 'ও' কেন পাখী হলোনি। তা হ'লে 'ও' ত উড়ে যেতে পারতো দূরে নীল আকাশের গায়। মুক্তির কামনা মহুয়ার মনে দোলা দেয়। মহুয়া দেখে লোহার জাল ঘেরা ফাঁসি-ডিগ্রী। অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠে। মহুয়া ভাবে ওর যদি ফাঁসি হয়? চোখের কোণা জলে ভ'রে আসে জীবনের মমতায়, চোখ জলে ভরে যায়। আবার ফিরে আসে একটা নির্ভীকতা, মহুয়া ভাবে 'ও' ফাঁসি, যাবে 'ও' হাসতে হাস্‌তে, দেশের জন্য মর্‌বে, উত্তেজনার গর্বে বুকখানা ফুলে ওঠে কিন্তু আবার মায়া হয় জীবনের উপর···এই শরীর, রক্ত মাংসের এই সবল সুস্থ শরীরটার উপর মমতা জাগে মহুয়ার। কিসের জন্য সে তার এই সুন্দর দেহটাকে বলি দেবে? উষ্ণ চিন্তা মহুয়ার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। মাটির উপর মাথা রেখে মহুয়া ঘুমিয়ে যায়, ঠাণ্ডা মাটি ওর মনের উষ্ণ চিন্তাগুলোকে অপহরণ করে···জটিল সমস্যাগুলো ফুটন্ত ভাবনাগুলো ঠাণ্ডা হয়, ঘুমিয়ে যায় মনের.

মধ্যে। ঘুম যখন ভাঙলো তখন রাত হ'য়ে গেছে—ওর খাবার শেলের মধ্যে রেখে দিয়ে জেল-মুস্তি বিদায় নিয়েছে, শাস্ত্রীরা ওর শেলের দরজায় তালা বন্ধ করে গেছে। দূরে সেণ্ট্রাল টাওয়ার থেকে ভেসে আস্চে আজানী সুরের একটা একটানা চীৎকার—পূ—র্ব—ডি—গ্রী—উ—পর—প—শ্চিম—ডি—গ্রী—নী—চে আর তারই পাল্টা জবাব 'ঠিক হ্যায়'। পশ্চিম ডিগ্রী উপরের রাজনৈতিক বন্দীরা গান ধরেছে—"বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ, নব যুগ ঐ, এলো ঐ, ঐ এলো ঐ, রক্ত যুগান্তরের।" নব যুগের গান মহুয়াকে মুগ্ধ করে—ঐ গানের সুরে নিঃশঙ্কার দুরন্ত ঘর ছাড়ার আহ্বান। বাউল সাধক তার জীবনের সব কিছু দান করে ঐ নূতন যুগের তপস্যা করছে—সে দিনের গান—যেদিন মানুষের অন্তরের বাঁধ-ভাঙা পাগলা-ঝোরা আইন-কানুন, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ও নীতির বাধা-নিষেধের সব বেড়াই একদিন ভেঙে দেবে। বিশ্বাসের দৃঢ়তায় মুক্তির আনন্দে মহুয়ার মুখচোখ দীপ্ত হয়।

পরের দিন, সকাল হয়। বদ্ধ শেলের মধ্যেও আলো ঢোকে, শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসে—দেবতার দান মানুষের দানের মতো সংকীর্ণ নয়। মহুয়া ভাবে এই বাতাস এই আলোর উপর কৃতজ্ঞতা জাগে ওর—দীন, দুঃখী, ভিখারী, ভুখারী, সুন্দর, কুশ্রী সবারই উপর সমানভাবে বর্ষিত হয় দেবতার দান—'কৈ দেবতার দানে বঞ্চনা কৈ'? পথের পাশে ঐ যে গলিত কুষ্ঠ রোগী রয়েছে—ঐ যে মেথর অপরিষ্কার ময়লার

পাত্র বয়ে চলেছে এই বাতাস এই আলো ত তাদেরও ভালবাসে।

বেলা বাড়ে। পশ্চিম ডিগ্রী ওয়ার্ডের বন্দীরা হাতের বেড়ি আর পায়ের শিকলে ঝুন্ ঝুন্ শব্দ করে করে টিনের বাটিতে তাল দিয়ে দিয়ে গান গেয়ে বেরিয়ে আসে—

"মোরা ভাই বাউল চারণ
মানিনা শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে···।"

মুগ্ধ বিস্ময়ে মহুয়া দেখে, এরই মধ্যে দেবীদা রয়েছেন। দেবীদাকে দেখেই মহুয়া মাথায় হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে, দেবীদাও প্রতিনমস্কার করেন—মৃদু স্বচ্ছ হাসিতে দেবীদার মুখখানা ভরে যায়, ঝুন্ঝুন্ করে বাজে' দেবীদার পায়ের বেড়িগুলো। মহুয়ার অন্তরের দুর্বলতা মিলিয়ে যায়।

বেলা বাড়ে। মহুয়ার স্বস্তি থালায় সাজিয়ে জল খাবার আনে। বুড়োর বয়স পঞ্চাশের উপর—শীর্ণ দেহ—কোটরগত চক্ষু—সাদা চুল, মাঝে একটা ছোট চিক্চিকে টাক, ওর চাল-চলনে কথাবার্তায় একটা ঠাণ্ডা মিষ্টি ভাব।

"বাবু, আপনার খাবার এনেছি"—বুড়ো খাবারগুলো মহুয়ার সাম্নে রাখ্লো।

স্বস্তির কোঁচকান মুখখানা কেমন যেন করে উঠ্লো, চোখ দু'টো ছল্-ছল্ করে উঠ্লো।

নাও বুড়ো, তুমি দু'খানা—দু'খানা রুটি, একটু মাখন আর সামান্য চিনি মহুয়া ওর হাতে দেয়।

"আমাকে, আমাকে কেন," লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে বুড়ো বলে। ভীত শশকের মতো ওর ভীরু চাউনি—গোগ্রাসে গিল্‌ছে রুটি দু'টো—"ওঁক" দম আট্‌কে যায়, খক্ খক্ খক্, গলায় লাগে খাবারগুলো—হক্ হক্ হক্ বমি করে ফেলে বুড়ো।

"ছিঃ, একি করলে?"

লজ্জায় দুঃখে মলিন হ'য়ে যায় বুড়োর মুখখানা। মুখের থেকে ফেলে-দেওয়া খাবারগুলো তুলে খেতে যায় বুড়ো। "না, না, ওগুলো কেন, আরও দিচ্ছি"—বোকার মতো, অবোধ শিশুর মতো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায়, বুড়োর হ্যাংলা দৃষ্টি মহুয়ার অন্তরে বেদনা জাগায়। মহুয়া জলখাবার খায়, বুড়োও খায় কিন্তু আরো যেন ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে পাছে কেউ দেখে ফেলে।

"আচ্ছা বুড়ো, তোমার জেল হ'লো কেন?" মহুয়া ওকে জিজ্ঞেস করলো।

সে বাবু অনেক কথা, শুনবেন তা—আনন্দে জ্বল জ্বল করে ওঠে বুড়োর হল্‌দে চোখ দু'টো।

মহুয়া বিস্মিত হয়। ভাবে নিজেরই অপরাধের কথা বল্‌তে লোকটার এত আগ্রহ কিসের?

"আচ্ছা বল।"

বুড়ো আরম্ভ করে—দেশজুড়ে তখন মড়ক দেখা দিয়েছে বাবু,

ঘরে তিনজনের মায়ের দয়া। পরিবারের আর দু'টি ছেলের। খাবার নেই, ওষুধ নেই, ডাক্তার-বোদ্দি ডাকার পয়সা নেই··· বুড়োর চোখ দুটো জলে ভরে আসে ওর বিগত অভাব ওর চোখের সাম্‌নে প্রেতের মতো নেচে উঠে।

চোখের জল মুছে বুড়ো আবার বলে চলে—স্ত্রী আর ছেলে দু'টো যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে—রাতের পর রাত শুধু আগ্‌লে আছি—খাবার বলতে শুধু জল। বুড়োর চোখ ফেটে টস্ টস্ করে জল পড়ে···এই জল খেয়েই রুগীগুলো আর আমি দিন কাটাচ্ছি। একদিন আর থাকতে পারলাম না ; পেটের আগুন কি শুধু জলে নিভে? বড় ছেলেটা চেয়ে আছে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে, ওর ফ্যাকাশে চোখ দু'টো মেলে ও বল্লে—'বাবা, আর যে সইতে পারছিনে, ঐ একটু জল বার্লি আর নুন—একটু মিছরী মেলে না বাবা?' বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠ্‌লো যেন। কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেলাম—শুধু ভাবছিলাম—গরীবের কাছে নুনই মেলে না তার আবার মিছরী! একটা বাগানে অনেক পাকা আম রয়েছে···চোরা পথ দিয়ে চুপি চুপি বেড়া পার হ'য়ে ঢুকে পড়লাম, কতকগুলো আম পেড়েছি··· ঠিক সেই সময় মালী দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে এলো—ধরা পড়লাম—তারপর জুতো চড় চাপড়। বাবুদের পায়ে ধরে কত কাঁদলাম, কত অনুনয় বিনয় করলাম, কিন্তু বিধাতার লিখন কে খণ্ডাবে? বুড়োর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়লো।

কতদিন বাড়ীর খবর পাওনি তুমি? মহুয়া প্রশ্ন করলো।

বহুদিন হ'য়ে গেছে কোন খবরই আমি পাইনি। ভগবান জানেন ওরা বেঁচে আছে কিনা।—টস্ টস্ করে লোনাজল মহুয়ার চোখ বেয়ে খাবারের থালায় পড়লো।

না থাক্।

বুড়োও চোখ মুছ্‌লো। একটা সিগারেট ধরিয়ে মহুয়া মনটাকে হাল্কা করে ফেলে—পোড়া সিগারেটের ছাইগুলোতে দেওয়ালের চুনের গুঁড়ো মিশিয়ে স্নস্তি খৈনী পাকাতে থাকে। এলোমেলো চিন্তা আসে মহুয়ার মনে—মনের পর্দায় একে একে ভেসে উঠে কতকগুলি ম্লান মুখ—দেবীদা, গৌরী, ভোলা, দেবীদার সেই মরা ছেলেটা—বিশীর্ণ মলিন মুখখানা মহুয়ার অবচেতনার অন্তঃস্থল থেকে চোখের সামনে ভেসে উঠে—ফ্যাকাশে মলিন শীর্ণ মুখখানা, নিষ্প্রভ ম্লান ঘোলাটে চোখ দু'টো। মহুয়ার চোখের পাতা দু'টো জলে ভারি হয়—ও রুমালে মুখ ঢাকে।

জেলের মেথর নরেন আসে মহুয়ার ঘরের অপরিষ্কার-গুলো পরিষ্কার করার জন্য।

'নমস্কার বন্দীবাবু!'

'নমস্কার'—প্রতিনমস্কার করে মহুয়া—

'একটা বিড়ি দেন না বাবু, অনেকদিন খেতে পাই নি'—

মহুয়া ওকে একটা বিড়ি দেয়। নরেন আল্‌গোছে ওটা নেয়, দেশলাই দিতে যায় মহুয়া, সঙ্কোচের সঙ্গে হাত বাড়ায় নরেন।

'নাও, লজ্জা কিসের ?'—মহুয়া জিজ্ঞেস করে।

লজ্জা নয় বাবু, এই—নীচ কাজ করি না, ময়লা ঘাঁটি কিনা তাই…।

'ও বুঝেছি, তাতে কি, কোন দোষ হ'বে না, আর আমরা ওসব মানিনে।'

দেশলাইটা নেয় নরেন, কৃতজ্ঞতার হাসিতে ওর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়। মহুয়ার কাছে ব'সে নরেন গল্প করে।

—'তোমার কি করে জেল হ'লো নরেন ?'

সে আর বলেন কেন—খুন করে—একটা লোককে খুন করে ফেলেছিলাম। সঙ্কোচে নরেনের মুখখানা কালো হ'য়ে যায়, চোখ ছ'টো বিবর্ণ ফ্যাকাসে হ'য়ে পড়ে।

খুন করলে কেন ? এমন কি ঘটেছিল ? সহজভাবে মহুয়া প্রশ্ন করলো।

একটা জমির জল পাওয়া নিয়ে। কিছুতেই জল দেবে না, আর তৈরী ধানের চারাগুলো মরে যাবে—তাই। চুপ করলো নরেন। মহুয়া ওর মুখের দিকে তাকায়—ওর অসহায় করুণ চাউনি দিয়ে ও যেন মহুয়ার কাছে ক্ষমা চাইছে।

আজ ক'দিন তুমি ঘরছাড়া নরেন ?

সে আজ পাঁচ বছর,…আর ত সবে ন'মাস। এই জন্যেই ত বাবু এই নীচ কাজ করছি…অনেক মকুব পাবো বলেই ত…

একটা অজানা মুক্তির পুলকে ওর সারা দেহ রোমাঞ্চিত হ'লো।

বিড়িটা ধরিয়ে টান্‌তে টান্‌তে বেরিয়ে গেলো নরেন—'আজ আসি বন্দীবাবু, নমস্কার।'

মহুয়া স্নান সেরে, কাপড় ছেড়ে, চুল আঁচড়ে খেতে বসে। দূরে পাহারা দিচ্ছে জেল স্ুবেদার নিধানসিং। নূতন বন্দী-বাবুকে দেখে সুবেদার সাহেব এগিয়ে আসেন—'আদাব বন্দীবাবু'।

'আদাব'—প্রতিনমস্কার জানালো মহুয়া।

বিস্ময়ে হতবাক্ মহুয়া সুবেদারজীকে দেখে—লম্বা ছ'ফুট, চওড়া কপাটের মতো বিশাল বুক,...মাথায় সাদা রেশমী উষ্ণীষ, হাতে লোহার কড়া, মানান্‌সই দাড়ি গোঁফ...দেখ্‌লে লৌহ মানব বলেই ভ্রম হয়...সম্ভ্রমে মহুয়ার মাথা নুয়ে আসে।

কি দেখ্‌চেন বাবুসাব? সুবেদারজী প্রশ্ন করেন।

কিছু না...এই ভাবছি তুমিও ত আমারি দেশের মানুষ—। মহুয়ার কথায় একটা প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সুবেদারজীর বুকে বিঁধে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুবেদারজী বলেন—'কি করি বাবু, পেটের দায়।'

মহুয়া আর নিধানসিং। রাজবন্দী আর জেল সুবেদারের মধ্যে ভাব হয়। নিধানসিং কাজে অকাজে আসে, মহুয়ার সঙ্গে গল্প করে...লড়ায়ের গল্প। গত মহাযুদ্ধে কেমন করে জার্মান বাহিনীর গুলীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে—তারই গল্প। সুবেদারজী গল্প বলে আর মহুয়া অবাক্ হয়ে শোনে। একবার রসিকতা করে মহুয়া বলে—আচ্ছা

সুবেদারজী আপনার ভয় করতোনি? নিধানসিং হেসে উত্তর দেয়—না বাবু, লড়ায়ে মরায় আনন্দ আছে—লড়ায়ের নাম শুন্‌লে আমার প্রাণটা নেচে উঠে। মহুয়ার চা তৈরী হয়, পাউরুটির শ্লাইসগুলোতে মাখন মাখিয়ে দু'বন্ধুতে খেতে বসে। ওদের গল্প চলে এলোমোলো।

সেদিন রবিবার। সকাল থেকেই মহুয়া অপেক্ষা করছিল সুবেদারের জন্যে। অনেক পরে সুবেদার নিধানসিং এলো। ওর মুখের ছবিখানা মলিন। উদ্‌গ্রীব হ'য়ে মহুয়া প্রশ্ন করে—'কি হ'লো সুবেদারজী?'

কিছু না, পেটের মধ্যে বেদনা হ'চ্ছে।

অত বড় মানুষটা বেদনায় শুকিয়ে গেছে।

খুব কষ্ট হ'চ্ছে আপনার? সহানুভূতির সঙ্গে মহুয়া প্রশ্ন করে।

হাঁ বাবু, টিক্‌তে পারছিনে, যন্ত্রণায় মুচড়ে দেয় ওর শরীরটাকে, 'উঃ' কেঁদে ফেলে নিধানসিং।

অজস্র ফল্গুধারায় ওর চোখের জল বেরিয়ে আসে··· পাষাণের মত কঠিন যে দেহমন তারো অন্তরে রয়েছে এই অজস্র অশ্রুজল। নেতিয়ে পড়ে সুবেদার নিধানসিং। মহুয়া জল আনে—পাখা করে···প্যাণ্টের বাঁধন আল্‌গা ক'রে পেটের উপর সাবান ঘষে—আরাম বোধ করেন সুবেদারজী, একটু পরে সুবেদারজী উঠে বসেন। তখনও ওর চোখে বিন্দু বিন্দু জল ঝর্‌ছে। রুমাল দিয়ে মুখখানা মুছিয়ে

দেয় মহুয়া। বুড়ো সুবেদার আনন্দ পায়। কৃতজ্ঞতায় ওর অন্তর ভরে যায়, মহুয়াকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় সুবেদার—বাবুজী—বাবুজী—আবেগে ফেটে ফেটে পড়ে ওর কথাগুলো, অনেক পরে সুবেদার চলে যায়।

স্নানের সময় হ'য়ে গেছে। মহুয়া নিজের ওয়ার্ডে ইতস্ততঃ পায়চারী করছে···এখনো স্নানের জল আসে নাই···কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ওধারের ওয়ার্ডের একজন বন্দী উঁকি মারছে। ওর দিকে এগিয়ে যায় মহুয়া, দরজার সামনে দাঁড়ায়···কপাটের ফাটল দিয়ে পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখ্‌তে পায়।

'নমস্কার বন্দীবাবু।'

'নমস্কার'—প্রতিনমস্কার করে মহুয়া। তোমার নাম কি?

'রসিদ।'

তোমার জেল হ'লো কি করে? মহুয়া ওকে প্রশ্ন করলো।

ও—পকেট মেরে। এই ত আমার পেশা, মেয়াদ শেষ হ'লেই একবার বের হই, আবার কিছু ছিনিয়ে নিতে গিয়ে ধরা পড়ি, আবার আসি এখানে, এই বাঁধানো ঘরে···হো—হো—হো—হেসে গড়িয়ে পড়ে রসিদ।

তাক লেগে যায় মহুয়ার। জেল-বার্ড লোকটাকে দেখে বিস্মিত হয়।

বেশ আছি বাবু, দুনিয়ার কোন ভাবনা চিন্তে নেই—নাই-আছের ভাবনা নেই···দুনিয়া ডুবলেও আমার এক হাঁটু।

কিছু ভালমন্দ খাবো তাও মিলে যায় সেপাই ব্যাটাদের অনুগ্রহে, দু'পয়সা দিলেই জুটিয়ে দেয়।

কিন্তু দু'পয়সা পাবে কি করে, এখানে হাতে পয়সা পাবে কি করে? মহুয়া বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলো।

সবই সম্ভব বাবু, এই মিয়া সবই পারে, দেখ্‌বেন? হক্ করে উঠ্‌লো রসিদ—একটা হাফ্-গিনি বেরিয়ে পড়লো ওর গলা থেকে।

বাঃ, বেশ যাদু জান দেখচি! মহুয়া বিস্মিত হ'য়ে বলে।

যাদু নয়, একেবারে আস্ত জলজ্যান্ত থলি আছে; আর জমা আছে এমন বিশ-পঞ্চাশটা হাফ-গিনি—পকেট-মারদের এটা না থাকলে চলে না বাবু! পকেট মেরেই বাস্ কুড়িয়ে নিলাম। কোন শালা ধরে,—হো—হো ক'রে রসিদ হাস্‌লো আবার।

স্নানের জল আনা হ'য়েছে। স্বস্তি ডাক্‌ছে—বাবু আসুন, জল এসেছে, বেলা হ'য়ে গেছে।

—'যাই', মহুয়া ফিরে আসে।

'নমস্কার বন্দীবাবু'—নমস্কার ক'রে রসিদ ওদিকে চলে যায়।

স্নান সেরে মহুয়া ভাত খেতে বসে—ভাতের সঙ্গে অনেকগুলো সুস্বাদু তরকারী, মাংস, চাটনি, দই। বেশ খেলো মহুয়া—খাওয়া শেষ ক'রে পাতের উচ্ছিষ্ট ভাতগুলো মাংসটুকু স্বস্তির দিকে ঠেলে দেয়। পরম তৃপ্তির সঙ্গে বুড়ো খায়—প্রতিটি গ্রাসে তৃপ্তির একটা ঢেউ ওর শিরা-উপশিরা বেয়ে চোখ-মুখে ফোটে। একটা শিহরণ বয়ে যায়।

বুড়োর কোঁচকান চোয়াল দু'টো—ওর ফোক্‌লা মাড়ির নিষ্কর্মা খাপছাড়া দাঁতগুলো মেতে ওঠে মরিয়া হ'য়ে, চিবুতে থাকে হাড়—চর্বিযুক্ত খাসী-ছাগলের খাস্তা হাড়। জিবটা চুষ্‌তে থাকে চর্বি, মজ্জা—হাড়ের ভেতরের মজ্জা।

হাত মুখ ধুয়ে মহুয়া একটা পান গালে দেয়। ওর মিষ্টি সুবাসিত এলাচ, দারুচিনি, কিমামের গন্ধ বের হ'য়ে আসে। একটা সিগারেট ধরিয়ে মহুয়া ধীরে ধীরে ধোঁওয়া ছাড়ে। মাথার উপরে ঘুর্‌ছে আকাশের অসীম শূন্যতায় একটা চিল অবাধ আনন্দে। অনন্ত—আকাশ প্রাচীরহীন মুক্ত আকাশ—কেউ ওখানে বেড়া দেয় নি। বৈজ্ঞানিকদের অবিষ্কারের কথা মনে করে মহুয়া—উড়ো জাহাজের কথা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বের হ'য়ে আসে ওর বুক থেকে—হায়, এরও হয়ত পরিত্রাণ নেই···একদিন ঐ মুক্ত স্বচ্ছ উদার আকাশের মধ্যেও গণ্ডী গড়বে মানুষ—বেড়া দেবে একজাতি অন্যজাতিকে নিষেধ করে···ঐ অদূর বদ্ধতার কথা মনে করে মহুয়া আঁৎকে ওঠে।

খাওয়া শেষ করে সুস্তি বাসন মাজে···এঁটো বাসনগুলো পাঁশ দিয়ে ঘষে ঘষে চক্‌ চকে করে তোলে। দিবা-নিদ্রায় এলিয়ে পড়ে মহুয়ার দেহ। বিকেলে ঘুম যখন ভাঙলো তখন সুস্তি চা তৈরী করে ডাক্‌ছে—'বাবু বাবু, উঠুন, চা খাবেন।' মহুয়া চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজের হেড্‌ লাইনগুলোয় চোখ বুলোয়।

ইতস্তত: চোখ দেয় মহুয়া। ওয়ার্ডের কপাটের ফাঁকে দেখা যায় ওদিকের কয়েকটি উৎসুক চোখ—লোলুপ ব্যথাতুর নরম তু'টি চোখ। চা নামিয়ে উঠে যায় মহুয়া। একটি সৌখিন ছেলে, বয়স কুড়ি-বাইসের মতো, ওর নরম কচি মুখখানা ঢল্ ঢল্ করছে। বড় বড় ব্যথাতুর ঠাণ্ডা চোখ তু'টো বেদনা জাগায় মহুয়ার মনে। 'আহা, বেচারা কেন এসেচে এখানে!'

'নমস্কার দাদা'—বিনীতভাবে সলজ্জ ছেলেটি মহুয়াকে নমস্কার জানায়।

'তুমি কেন এলে ভাই?'—নরম সুরে মহুয়া প্রশ্ন করলো।

ও জিজ্ঞেস ক'রে আমাকে লজ্জা দেবেন না—ছেলেটি সঙ্কুচিত হ'য়ে বল্লে।

কেন, কিসের এত সঙ্কোচ, বলই না—জেদ করে মহুয়া।

—না, পারবোনি, আপনি দাদার মতো—ঐ ঘৃণিত ইতিহাস বল্‌তে পারবোনি আপনাকে।

বল বল, এখানে আবার সঙ্কোচ—মহুয়ার জেদ যেন বেড়েই চলেছে।

মাথা নামিয়ে ছেলেটি বলে—একটি মেয়েকে ভালবাসতুম ব'লে—অপরাধীর মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে মাটির দিকে চেয়ে থাকে ও।

—'কেন, মেয়েটি কি তোমাকে ভালবাস্‌তোনি?' মহুয়া বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করে।

—তা কেন, তা নয়, তবে আমরা যে একজাত ছিলুম না।

মহুয়া ফিরে আসে নিজের শেলে, ছাইভস্ম কত কি ভাবতে ভাবতে। অসহায় মানুষের কথা ভাবতে ভাবতে মহুয়ার চোখে জল আসে। ভগবান মানুষকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান দিয়েছেন, গৌরব দিয়েছেন, অগৌরবও দিয়েছেন, ক্ষমতাও দিয়েছেন, অক্ষমতাও দিয়েছেন। এই জেল, জেলই ত ভাল···অক্ষমতার অপরাধকে শাস্তি দিয়েও তৃপ্তি আছে আর সে-ই এইখানে। পৃথিবীর আলো, বাতাস, ফুল, শষ্যে যাদের অধিকার নেই তাদের এই ত পরম পবিত্র স্থান। এখানে একজন অপরাধীকে দেখ্‌লে অসংখ্য সকৌতুক দৃষ্টি তাকে আঘাত করে না। একজন পাপীকে দেখ্‌লে পাশের লোক ঘৃণায় সঙ্কুচিত হ'য়ে দূরে সরে যায় না। —অনুশোচনার আগুন অপরাধীকে পুড়িয়ে মারে না। এখানে গলাগলি জড়াজড়ি ক'রে আছে অসংখ্য পতিত মানুষ, ঘৃণ্য মানুষ। একের প্রাণ অন্যের জন্য কাঁদে—পকেটমার চোরকে ভালবাসে, চোর খুনীকে বুকে জড়িয়ে ধরে, লম্পট খুনীর বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোয়। অধিকারের কাড়াকাড়ি নেই, বঞ্চনার ক্ষোভ নেই, প্রভুত্বের দাবী নেই। বঞ্চিত মানুষের বিদ্রোহী আত্মা এখানে মাথা তুলে আছে। কে বলে জেলের ভিতরে মানুষের বদ্ধতা···পরিপূর্ণ মুক্তির স্বাদ মানুষ এরই মধ্যে পায়। মানুষের তৈরী নীতি, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, আইনের বাঁধনে যারা বাঁধা পড়লোনি তারাইত এসেছে জেলে।

রাত নামে। আকাশে চাঁদ ওঠে—ত্রয়োদশীর চাঁদ। ওর জ্যোৎস্নার প্লাবনে সমস্ত জেলটা উদ্ভাসিত হয়...দেবতার দেওয়া উদার স্নিগ্ধ আলো—সবারই সমান ভাগ, সবারই সবটুকু, প্রত্যেক জীবের সমান অংশ এতে। ঐ যে মুক্ত বাতাস ব'য়ে চলেছে—ও ত দেবতার দান, ঐ যে সমুদ্রের জল, নদীর বালি, বনের ফুল—সবই প্রকৃতির অকৃপণ দান।

স্বস্তি নিয়ে আসে রাতের খাবার। নিধানসিং অদূরে পাহারা দিচ্ছে। পশ্চিম ডিগ্রী ওয়ার্ডের বন্দীরা গাইছে—

বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ,
নবযুগ ঐ এলো ঐ।

সুন্দর সে গান মহুয়া শোনে। সুরের মিষ্টতার চেয়ে গানের ভাব প্রাণের আবেগকে বেশী নাড়া দেয়। একটু পরে একজন শাস্ত্রী জোরে হুকুম করে—এই বাবু, মাৎ গাইয়ে, হাল্লা মাৎ কিয়ে। হো—হো—হো—সমবেত বন্দীদের উচ্ছ্বসিত হাসি। বিরক্তির সঙ্গে শান্ত্রী গর্জন করে—এই বাবু, ফিন্ হাল্লা কাহে কর্‌তা, হাল্লা মাৎ কিয়ে। আবার বন্দীদের প্রাণ-খোলা হাসি...তবে এক সঙ্গে নয় ইতস্ততঃ ভেঙে ভেঙে।

চুপ করে সেপাই। বন্দীরা গায়। বাতাসে ভেসে আসে গানের মিষ্টি সুর। খাওয়া শেষ করে মহুয়া। স্বস্তিকে বাকী খাবারগুলো ধরে দেয়। খরগোসের মতো তাকায় বুড়ো... চোখের আড়কোণে নিধানসিংকে দেখে, আবার গিল্‌তে

থাকে। মহুয়া একটা সিগারেট ধরায়, মনের পর্দায় ভেসে ওঠে পরিচিত মানুষের মুখ, রাস্তাঘাট, মাঠ, নদী, প্রান্তর…।

হঠাৎ শোনা যায় জেলের মধ্যে পাগলা ঘণ্টির শব্দ। চারিদিকে একটা হৈ চৈ সাড়া পড়ে যায়। চারিদিকের শান্ত্রীরা ছুটে আসে সেণ্ট্রাল টাওয়ারের দিকে…সুবেদার নিধানসিংও ছুটে যায় সেখানে। একটু পরেই শান্ত্রীদের মার্চিং সুরু হয় মচ্ মচ্ মচ্ মচ্—বুট্ জুতোর কোরাস শব্দ।

একটু পরেই ভেসে এলো অনেক লোকের গোঙানি, কাৎরানি। মহুয়া বুঝতে পারে পশ্চিম ডিগ্রী বন্দীদের মার দেওয়া হচ্ছে বলে। নির্মম সে অত্যাচার আর তারই ফলে ঐ করুণ কাতর চীৎকার।

আধ ঘণ্টা পরে শান্ত্রীরা চলে গেল। ডাক্তার আর ওষুধ পাঠানো হ'ল। অনেক বন্দীই তখন জ্ঞান হারিয়েছে। বিছানায় শুয়ে পড়েছে মহুয়া। বাতাসে ভেসে আস্‌ছে বন্দীদের অস্পষ্ট কাতর আর্তনাদ। জ্ঞান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা যন্ত্রণা অনুভব করছে…রাত বাড়ছে যন্ত্রণাও বেড়ে চলেছে, মনে হ'চ্ছে অনেকগুলো নিরীহ জীব যেন জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে… গোঙাচ্ছে…রাতটা যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। সারাটা রাত মহুয়া একবারও চোখের পাতা ফেল্‌তে পারে না—ঘোর আর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন মনের মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে যাতায়াত করছে একটা অত্যাচারের নির্মম অনুষ্ঠান—রক্ত, খুন, মাথাফাটা—একটা দানবীয় হিংস্র মূর্তি…নির্মম মানুষের ভয়াবহ চেহারা…অসহায়

মানুষের করুণ কাতর চাউনি···নির্ভীক বিদ্রোহীর নিঃসঙ্কোচ ভয়হীন স্থিরমূর্তি ঘোরাফেরা করে মহুয়ার চেতনা আর অবচেতনায়—আবর্তের মত ঘুরে ঘুরে আসে ঘোরের মধ্যে এই সব চেহারা। ঘুমের মধ্যে বীভৎস কী সবমূর্তি দেখে মহুয়া। মহুয়ার বুকের শূন্যতায় একটা অসহায় কান্না বার বার মোচড় দিয়ে ওঠে। চোখের কোণায় জল দেখা দেয়।

সকাল হয়। সূর্যের লাল্‌চে আলো জেলের সাদা দেওয়ালে পড়ে। টস্ টসিয়ে রক্ত যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ছে। জেলখানা জাগে···জেগে ওঠে বন্দী মানুষের আকুল আগ্রহ। ঘুমের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত ছিল তাই জাগে। সবারই এক আশা,একই আকাঙ্ক্ষা—বাইরের আলো কোথায়? মুক্ত বাতাসের স্বাদ কোথায়? সবারই চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে চিরপরিচিত মাঠ, ঘাট, বন, রাস্তা, তৃণ, গুল্ম, লোকজন। এতগুলি মানুষের দাবী শুধু একটি, মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি—। টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম কিছুই চায় না এরা। সবাই চায় শুধু মুক্তি—বাইরের বাতাসের স্বাদ। গতরাত্রের ব্যাপারখানা জান্‌তে চায় মহুয়া কিন্তু কারো তেমন দেখা নেই। নিধানসিংও আসে না।

বেলা বাড়ছে। মহুয়া দেখে দু'জন শান্ত্রী আর নিধানসিং পশ্চিম ডিগ্রীর গেট্ খুল্‌ছে। নানা ইসারায় মহুয়া সুবেদারজীকে ডাকে কিন্তু সাড়া দেয় না নিধানসিং।

গেট্ খুল্‌লো, একটু পরেই শান্ত্রীদের সঙ্গে বেরিয়ে এলো দু'জন বন্দী—এদের একজন দেবীদা। ওদের চোখমুখে

কালশিরের কালো দাগ, চেহারাগুলো ম্লান বিবর্ণ ঝড়ের পরের চারা গাছগুলোর মতো। ওদের দেখে মহুয়া আঁৎকে ওঠে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরা দেবীদাকে ? অহেতুক ভয়ে মহুয়ার অন্তর আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। অস্থিরভাবে মহুয়া দেবীদার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু দেবীদা ফেরে না। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়, বিকেল পেরিয়ে নামে সন্ধ্যা। কালো ধোঁয়াটে অন্ধকারে ফ্যাকাসে হ'য়ে সূর্যের লাল আলো দেওয়ালের ওপারে মিলিয়ে যায়। মহুয়ার শেলে তালা মেরে সেপাই বিদায় নেয়। কান খাড়া ক'রে থাকে মহুয়া কোনরূপ শব্দ শোনার জন্য···কিন্তু কৈ কোন সাড়া শব্দ নেই—সবই নিঝুম নীরব। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে যায় মহুয়া।

দিন যায়। দিনে দিনে মাস যায়। সুবেদার নিধানসিং আবার ধরা দিয়েছে মহুয়ার কাছে। মহুয়া সুবেদারকে নমস্কার করে। সুবেদারও প্রতিনমস্কার করে। সুবেদারের দাড়ি গোঁফে হাত বুলোয় মহুয়া, ওর আদরের নীচে সুবেদার বিবশের মতো গলা বাড়িয়ে দেয়। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে গেছে। মহুয়া সুবেদারজীকে প্রশ্ন করলো—'আচ্ছা সুবেদারজী, দেবী-বাবুকে আপনি জানেন ?'

'জানি ত বাবু, হুঁ—' একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বের হ'য়ে আসে সুবেদারের বুক থেকে।

জড়িতভাবে সুবেদারজী বলেন—'ও বাবুলোক ত হাঁসপাতালে মারা গেছেন।'

মহুয়ার চোখের সাম্‌নে থেকে সব আলোগুলো যেন এক সঙ্গে কেউ নিভিয়ে দিলে, পাথরের মতো স্তব্ধ নিশ্চল হ'য়ে গেলো মহুয়া। অনেকক্ষণ কিছুই ভাবতে পারলে না মহুয়া। তারপর ঘৃণায় ওর মুখটা কুঁচকে উঠ্‌লো যেন—সমস্ত শান্ত্রীদের উপর ঘৃণায়। ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর মনের একটা কঠিন ভাব কপালের রেখায় রেখায় স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো, কঠিন ইস্পাতের মতো চোয়ালগুলো শক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো—না, মহুয়া কাকেও ক্ষমা কর্বে না—সুবেদার নিধানসিংকেও না। মহুয়ার চোখের সাম্‌নে জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠ্‌লো দেবাদাকে ঘিরে অজস্র স্মৃতি। একটা বিরাট প্রাণ কোথায় হারিয়ে গেলো, এত বড় একটা প্রাণশক্তি এক মৃত্যুতে শেষ হ'লো? প্রশ্নের রেখায় কুঁচকে উঠ্‌লো মহুয়ার মুখ। না, না, মরে না, মরে না, মরতে পারে না দেবীদার মতো একটা প্রাণশক্তি। মৃত্যুতে নিঃশেষিত হয় না, হ'তে পারে না—বিশ্বাসের দৃঢ়তায় জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠ্‌লো মহুয়ার চোখ দু'টো। দেবীদা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে—ভোলা, অসিত, মহুয়ার মনে বেঁচে থাক্‌বে।

লোকে জান্‌তো, বাইরের লোক জান্‌তো দেবীদা মাতাল—কেউ খোঁজ করেনি কত বড় দেশপ্রেমিক এই দেবীদা। নাম, যশ, সম্মান কিছুই চাননি দেবীদা, নিজেকে নীচ, হীন প্রতিপন্ন ক'রে মেয়েছেলেদের মরণের মুখে ঠেলে দিয়ে কে পারে এইভাবে দেশের সেবা করতে? দেবীদার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রে মহুয়া ওঁর পূজো কর্বে। মহুয়া তন্ময় হ'য়ে দেবীদার কথা ভাবে,

ভাবে—বৌদির কথা, ভোলার কথা, অসিতের কথা। মহুয়ার মনের পর্দায় দেবীদার মরা-ছেলেটার ম্লান বিবর্ণ শীর্ণ চেহারাটা ভেসে ওঠে—ভেসে ওঠে বৌদির ফ্যাকাসে পাথরের মতো মুখখানা—দেবীদা,অদ্ভুত এই দেবীদা ! কত বড় ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, সাহস ও দেশপ্রেমের প্রতীক্ এই দেবীদা। জগতের কোন অমূল্য কোহিনূর দিয়েও এদের দেশপ্রেমকে কেনা যায় না। মহুয়ার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে অসংখ্য মূর্তি…ভেসে ওঠে গান্ধীজির সৌম্যশান্ত মূর্তিখানা…লক্ষ আততায়ীর শাণিত অস্ত্রের সামনে নিরস্ত্র নির্ভীক…প্রেমের দেবতার অপূর্ব সুঠাম মূর্তি… সহজ সরলতার শুভ্র নিষ্কলুষ মূর্তি। লক্ষ ছোরার আঘাতও এদের মানুষের প্রতি মমতায় একটু আঁচড় লাগাতে পারে নি। চোখ বন্ধ করে মহুয়া। ওর চেতনায় আর অবচেতনায় ঘোরাফেরা করছে অসংখ্য মূর্তি—অসিত, মীনাদি, ভোলা, বৌদি, রতন, দেবীদা—গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র, রসিদ, নরেন…।

* * * *

মহুয়াকে অন্তরীণ ক'রে পাঠানো হ'বে মৈমনসিংহ জেলার একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে। খবর পেয়েই মহুয়ার মন একটা অজানা আনন্দে ভরে ওঠে—বাইরে যেতে পাবে মহুয়া—মুক্ত আলো বাতাসের স্পর্শলাভ কর্বে। আবার মমতা জাগে জেলের ওপর… নিজের শেলের উপর…কত স্মৃতি এই জেল আর শেলটিকে ঘিরে রয়েছে। হায়, মানুষের অন্তর কিছু ছেড়ে দিতে চায় না; অহেতুক মমতায় মানুষ আঁকড়ে থাকতে চায়—এই পৃথিবীর প্রাচীণ

ইতিহাস—পুরানো পচা ধ্বসে যাওয়া শরীরটাকেও তাই মানুষ ছেড়ে দিতে পারে না। বিদায়ের সময় আসন্ন হয়, সন্ধ্যার ট্রেনে মহুয়াকে চলে যেতে হ'বে। স্বস্তি, নরেন, রসিদ, সবারই মুখ বিষণ্ণ। ছেড়ে দিতে কি মন চায় তবু ছেড়ে দিতে হয়···ভাল মনেই ওরা বিদায় দেবে মহুয়াকে। এসকর্টের অধীনে মহুয়া জেল থেকে বের হয়। ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে বসে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে মহুয়া একবার মেদিনীপুর জেলকে প্রণাম করে। ···ছুটে আস্‌ছে নিধানসিং—বাবু, বন্দীবাবু, বাবুসাব্, মহুয়াবাবু—হাঁপাতে হাঁপাতে বৃদ্ধ সুবেদার ছুটে আসে। বাবুজী, বাবুসাব, মহুয়া-বাবু···নীরবে কাছে দাঁড়ায় বৃদ্ধ সুবেদার।

ধীরে ধীরে মহুয়া বলে, 'তবে আসি সুবেদারজী, আবার আস্‌বো।'

না বাবু, ওকথা বল্‌বেন না।

বৃদ্ধ সুবেদারের চোখের কোণা থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে টস্ টস্ ক'রে পড়্‌ছে মাটির উপর। বুকের মধ্যে মহুয়াকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ সুবেদার···মহুয়ার সব ঘুলিয়ে যায়, ওর মন চায় না একে ছেড়ে যেতে···অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে গেছে, আর দেরী করা চলে না, ঘোড়ার গাড়ী ছেড়ে দেয়, মহুয়া ভাবতে ভাবতে যায়—সবাই মানুষ তবে নীচে যায় কেন এরা?

আপন মনে প্রশ্ন করে মহুয়া, ওরই মনের ভিতর থেকে উত্তর আসে—'পেটের দায়।'

স্টেশনে আসে মহুয়া। সবই নূতন্ রূপ নিয়ে দেখা দেয় ওর

কাছে। এমন করে আর কোন দিন মহুয়া পৃথিবীর গাছপালা, রাস্তাঘাট, মাটি-পাথরের এই অভিনব রূপ দেখেনি—অদ্ভুত বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে মহুয়া সব দেখে—মানুষের চলাফেরায়, কথাবার্তায় ও যেন রূপলোকের মাধুর্য খুঁজে পায়। সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ ওঠে··· মহুয়ার মনে হয় ঐ যে ঝরে-পড়া চাঁদের আলো ও যেন রূপালী একটা ঝর্ণার মতই ওর অন্তরে বাইরে একটা তরল আলোর বন্য তুলে চলেছে···মিষ্টি বাতাসে ভেসে আসে একটা সুখস্পর্শ··· এলোমেলো বাতাসে মহুয়ার চুল উড়িয়ে মুখের উপর ফেলে। মহুয়া বসে আছে ট্রেনের কামরায়, জানালার ধারে হু হু ক'রে ছুটে চলেছে যন্ত্রদানব, হু হু করে পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে দুরন্ত বাতাস আর হু হু করে ছুটে চলেছে মহুয়ার মন মুক্তি-সন্ধানে। যন্ত্র-দানবের এত বড় ঝাঁকুনিতেও ঘুমন্ত গ্রামগুলোর কোন চেতনা নেই, নীরব নিসাড় ওরা ঘুমুচ্ছে, ওদের শ্লথ জীবনের ঢুলু ঢুলু চোখ জড়িত। ট্রেন ছুটে যায়···পাশের বাবলা, খেজুর, শেওড়া গাছগুলো আতঙ্কে যেন পিছিয়ে গিয়ে হাঁপাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে ওদের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। মহুয়া তাকায় আকাশের পানে, অসীম শূন্যতায় কত অশরীরী আত্মা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে— শেষ রাত্রির কাছাকাছি মহুয়া পৌঁছায় ওর বন্দীনিবাসে। ছোট একটি গ্রাম্য থানা, অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান, সামান্য তিন-চার ঘর হিন্দু। থানার পাশেই মহুয়ার ডেরা···ওর দক্ষিণে ছোট দারোগার বাসা। ভদ্রলোক হিন্দু কায়স্থ, বি. এ. পাশ করে পুলিশের কাজে ঢুকেছেন। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, স্বল্প

বেতন আর উপরি দিয়েই সংসার খরচ কোন রকমে চালিয়ে যান। এই চরের মধ্যে কোন স্কুল নেই, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই তাই করতে পারেন নি।

আচ্ছা মহুয়াবাবু, আপনার লেখাপড়া কতদূর? ছোটবাবু মহুয়াকে প্রশ্ন করে বসলেন একদিন।

'কতদূর আর···আই. এ. পাশ করেই জেলে এসেছি'— মহুয়া উত্তর দেয়।

—আরে ভাই, যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা অনুরোধ করি।

'কি বলুন না, এত সঙ্কোচের কি আছে?' শান্তভাবে মহুয়া বলে।

না, না, সঙ্কোচ আর কিসের, আপনাদের কাছে সঙ্কোচ কি বলুন, কালিদাসের কথাতেই বলি 'যাচ্ঞা মোঘাবরমণিগুণে', ভালো মানুষের কাছে নিবেদন করতে দোষ কোথায়, আপনারা দেশ-কর্মী, দেশের জন্য আপনারা এত করেছেন তাই বলছিলুম কি জানেন—ছোটবাবু আবেগে গদ্ গদ্ হ'য়ে পড়েন।

কি বলছিলেন তাই বলুন, লজ্জা পাবার কিছুই নেই।

এই যদি দয়া ক'রে সন্ধ্যেয় সন্ধ্যেয় ছেলেমেয়েদের এক আধটু দেখিয়ে দিতেন···। বিশেষ করে ভাই—বড় মেয়েটার কথা, জানেনই ত কায়েতের ঘরের ব্যাপার, মেয়েদের এক আধ্টা পাশ না করালে বিয়ের বাজার একেবারে অন্ধকার—বিশেষ করে ওরই জন্যে। আর এক কথা, যার তার কাছে ধরুন কিনা—পড়তে

দিতে ত পারিনে। হে—হে—হে, জানেনইত বয়স হ'য়েছে, তবে আপনাদের কথা ছেড়ে দিন্, আপনারা স্বার্থত্যাগী আদর্শ ছেলে দেবতুল্য তাই···মহুয়ার উপর সম্ভ্রমে নুয়ে পড়েন ছোটবাবু।

মহুয়া চুপ করে থাকে। একবার মনে হয়, না থাক্ কাজ নেই বয়স্থা মেয়ে পড়ানো···আবার ভাবে এত কাপুরুষতা এত দুর্বলতা কিসের ··রাজবন্দী মহুয়া এই সামান্য সংযমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না?

ওর আর কী, তা দেখিয়ে দেবো একবার করে—সহজভাবে মহুয়া বল্লে।

দেবেন ভাই দেবেন, কি যে উপকার হয় তা হ'লে, এই চর জায়গায় পড়ে মাঠে মারা যাচ্ছি—উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছেন ছোটবাবু। সামান্য বেতন···কোথাও পাঠিয়ে মেসের খরচ চালানো কি সম্ভব? অথচ এক আধটা পাশ করাতেই হ'বে। এই কত ব্যাপার দেখুন, দিনকাল কি যে হ'লো, লেখাপড়া গান-বাজনা, তারপর হাজার হাজার টাকা পণ, তবে মেয়ে উদ্ধার, হে—হে—হে, শুষ্ক মলিন হাসি হাসেন ছোটবাবু, আর তাই যেন ওঁকেই ব্যঙ্গ করে উঠ্‌লো।

* * * *

লীলার পড়ার ঘরে মহুয়া যায়······আগে থাকতেই তৈরী হ'য়ে আছে লীলা—ছোট একটি পড়ার টেবিল, দু'দিকে দু'টো চেয়ার, টেবিলের উপর সাজানো বই, খাতা, পেন্সিল, কলম, দোয়াত। বেশ ঝরঝরে তক্‌তকে করে ঝেড়েমুছে রেখেছে

লীলা ওর ঘরখানিকে। মহুয়া ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় লালা—'আস্থন স্যার', ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলো লীলা। কেমন একটা সঙ্কোচে জড়সড় হ'য়ে যায় মহুয়া। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে মহুয়া। আস্থন, চেয়ারে বস্থন আপনি, আমি চা আনিগে। লীলা চলে যায়, মহুয়া মন্ত্রাবিষ্টের মতো বসে থাকে। মহুয়া সহজ হ'তে চায়, পারেন না। একটা অহেতুক লজ্জা আর সঙ্কোচে ওকে জড়সড় করে দিচ্ছে যেন। মহুয়া আপন মনেই প্রশ্ন করে—কিসের এত সঙ্কোচ, তার ত সঙ্কোচ শোভা পায় না…নিষ্কাম দেশপ্রেমিকের ত সঙ্কোচের কিছু নেই। জ্ঞান হওয়ার দিন থেকেই যে মহান্ আদর্শের পিছু পিছু ছুটেছে, জীবনের সামনে যার বৃহত্তর আদর্শ, তার ত এ দুর্বলতা সাজে না—দেশের সাধারণ লোক বন্দীবাবুদের দেবতার মতো দেখে…ওর কি এত দুর্বল হ'লে চলে, আপন মনেই মহুয়া প্রশ্ন ক'রে, আপন মনেই উত্তর খোঁজে। গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে মহুয়া। লীলা চায়ের কাপ নিয়ে আসে। নিন্ স্যার—সঙ্কোচহীনভাবে লীলা মহুয়ার হাতে চায়ের কাপটি দেয়। 'নিই'—চায়ের কাপ নেয় মহুয়া, লীলার কোমল স্থন্দর আঙ্গুলের স্পর্শ লাগে মহুয়ার হাতে…সামান্য একটু ছোঁওয়া দেহের অণুতে অণুতে ঢেউ তুলে তুলে বয়ে যায়। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মহুয়া প্রশ্ন করে—কি পড়বে আজ ?

'প্রথম ইংরেজী, তারপর অঙ্ক কষবো স্যার।'

'আচ্ছা তাই, ইংরেজী আরম্ভ কর।'

মুখটা যতদূর সম্ভব নামিয়ে কথা বলে মহুয়া।

ইংরেজী পড়ার এক আধ্‌টু বুঝিয়ে দিয়ে চুপ করে মহুয়া।

লীলা অঙ্ক কষে। অনেকক্ষণ ধরে একটা অঙ্ক নাড়াচাড়া করছে কিন্তু উত্তর মিলাতে পারছে না,—'পারছিনে স্যার।'

'কৈ, দাও দেখি'—মহুয়া বলে।

লীলা খাতা-পেন্সিল মহুয়ার হাতে দেয়...সেই লীলার নরম কোমল কচি আঙ্গুলের সঙ্গে একটু ছোঁওয়া। পুলকে শিউরে ওঠে মহুয়া, লীলার চোখে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠে তখনই মিলিয়ে গেলো।

মহুয়া লজ্জিত হ'য়ে মুখ নামায়। অঙ্কটি কষে আবার ফিরিয়ে দেয় মহুয়া খাতা-পেন্সিল লীলাকে, তবে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত—আলগোছে। বাইরের দরজায় জুতোর জোর শব্দ, ইচ্ছাকৃত দু'তিনটে কাসি...ছোটবাবু ঘরে ঢুকলেন।—মহুয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়—হাঁ, হাঁ—বসুন, বসুন—কেমন দেখ্‌চেন, লেখাপড়া হ'বে ত একটু...কুণ্ঠিতভাবে ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

হ'বে না কেন বলুন, না হবার কি আছে—মহুয়া উত্তর দিলে।

তা ভাই, আপনি না থাক্‌লে এই চর জায়গায় কি যে হোত—ভয়ানক উপকার করলেন আপনি।

আচ্ছা, রাত হ'লো, আজ তবে আসি, বাসায় যাবার জন্য মহুয়া উঠে দাঁড়ায়।

আচ্ছা, আসুন। সম্মতি দেন ছোটবাবু।

বাসায় ফিরে এসেছে মহুয়া। অন্য দিনের চাইতে আজ যেন ওর স্ফূর্তিটা অনেক বেশী—মনের মধ্যে একটা অজানা আনন্দ ফেনিয়ে ওঠে—অনেক কথাই মহুয়া চিন্তা করে—লীলা, বাঃ, বেশত এই লীলা—মহুয়া ওকে ভাল করে দেখ্‌তে পারেনি··· কিসের যেন একটা লজ্জা, একটা সঙ্কোচ মহুয়াকে পেয়ে বসেছিল ···কিন্তু কিসের এত দুর্বলতা ?—মহুয়া আপনাকে প্রশ্ন করে। লীলাকে মহুয়া মা ব'লে ডাকবে তাহলে ওর আর কোন সঙ্কোচ আর কোন লজ্জা থাক্‌বে না। চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে যায় মহুয়া।

পরের দিন সকাল হয়। সূর্যের আলো যেন মহুয়ার জন্যে ব'য়ে এনেছে একটা অজানা আনন্দের প্রবাহ···সোনালী সূর্যালোতে মহুয়ার মনটা ভরে যায়। খুঁটি-নাটি কাজের মধ্যেও আজ যেন একটা আবেগ মহুয়ার মন থেকে উপ্‌ছে পড়তে চাইছে। গুন্ গুন্ করে গান ধরে মহুয়া। সারাটা দিন উত্তেজনায় আর আনন্দে ভ'রে আছে ও। সন্ধ্যা হল। সাজগোজ করছে মহুয়া···একটা মিহি খদ্দরের ফর্সা ধুতি আর সদ্য-ইস্ত্রি-করা মিহি খদ্দরের সাদা ফুল-সার্ট পরে··· পায়ে দেয় বর্মীয় চপ্পল, মাথার চুলগুলো ব্যাক ব্রাস করে নেয়···ঠিক সেজে নিয়েছে, না, এরপর যেতে হ'বে—আর একবার মহুয়া ফিরে আসে, মুখটা রুমাল দিয়ে মোছে···আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলো আবার আঁচড়ায়—না, বেশ হ'লোনি, আরো

একবার আঁচড়ায়—হ্যাঁ, এদিকের চুলগুলো যে একটু ভেঙে পড়লো···চুলগুলো জল দিয়ে ভিজিয়ে নেয় মহুয়া, আর একবার আঁচড়ায়, আবার আয়নার সামনে দাঁড়ায়, আর একবার···হাঁ আরো একবার···ব্যাস্‌, ঠিক হ'য়ে গেছে, কোঁচার খুঁটটা পকেটে গোঁজে—ঠিক হ'লোনি, বাঁ হাতের মুঠোয় ধ'রে চল্‌তে থাকে মহুয়া ধীরে ধীরে ছোটবাবুর বাসায়, লীলার পড়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায়। একবার মনে করে লীলাকে মা বলে ডাক্‌বে কিন্তু কে যেন ওর কণ্ঠ চেপে ধরে···একবার লীলার নাম ধরে ডাকতে চেষ্টা করে কিন্তু সঙ্কোচে কথাগুলো মুখের মধ্যেই আটকা পড়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মহুয়া।

'আসুন স্যার।' লীলা দরজা খুলে দেয়। বসুন চেয়ারে, চা আনিগে। লীলা চলে যায়, মহুয়া বসে পড়ে। লীলা চায়ের কাপ নিয়ে ফিরে আসে, কাপটি মহুয়ার হাতে দেয়। সেই হাতে হাতে ঠেকা একটা বৈদ্যুতিক ঢেউ শরীরের শিরা-উপশিরা বেয়ে বেয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। একবার লীলাকে দেখ্‌লে মহুয়া—ওর রূপের আগুনে উষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো মহুয়ার কামনাগুলো।

চমকে উঠ্‌লো মহুয়া। ভয়, কিসের ভয়, কিসের সঙ্কোচ। আত্মজয়ী নিষ্কাম দেশ-কর্মী মহুয়া, ওর সংযম কি এত তুচ্ছ ? গর্বে মহুয়ার বুক ফুলে ওঠে। লীলার শ্রদ্ধা অর্জন করবে মহুয়া। ছাত্রী লীলা মহুয়ার কন্যার মতো, আপন মনেই মহুয়া প্রশ্ন করে আর আপন মনেই উত্তর দেয়। কিন্তু বয়স ? বয়সের

ধর্মকে কি দিয়ে ঠকাবে? অচেতন মনের 'একটা কুলটি কামনা সংযমের ঘুল্‌ঘুলি দিয়ে উঁকি মারে। পড়াতে পড়াতে আবার সেই হাতে হাতে ছোঁওয়া, সেই অজানা অনুভূতির শিহরণ! প্রকৃতিস্থ হয় মহুয়া। সংযমী যুবক মহুয়া।

দিন যায়। মহুয়া জয় করেছে ওর প্রকৃতিকে, দমন করেছে ওর অন্তরের ক্ষুধাকে। অভ্যস্ত কাজের মতোই এখন মহুয়া লীলাকে পড়িয়ে চলে, কোন সঙ্কোচ বা লজ্জা নেই, আর দুর্বলতা কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু আকর্ষণ—তাকে কি অস্বীকার করা যায়? জয়ই যদি ক'রে থাকে মহুয়া, তবে প্রতিদিন শরীরের সব অবস্থাতেই কেনই বা যায় লীলার কাছে? লীলার ঐ কালো চোখের তারায় কি খোঁজে মহুয়া? ঐ কালো ঢল্‌ঢলে চোখের অতল গহ্বরে কিসের সন্ধান করে ও? পড়াতে পড়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে তন্ময় হ'য়ে গিয়ে ঐ কালো চোখের রেখার উপর চোখ রেখে কি জান্‌তে চায় মহুয়া?

কোন দিন হাতের একটু স্পর্শ না পেলে সেদিন সারাটাদিন কেনই বা ও আনমনা হ'য়ে পড়ে, কেনই বা ওর ঘুম থাকে না চোখের পাতায়? বাইরের লোক বিস্মিত হয় বন্দীবাবুকে দেখে, ছোটবাবু শ্রদ্ধা করেন মহুয়াকে। লীলা মাথা নোয়ায় মহুয়ার কাছে।

সেদিন সন্ধ্যে বেলায় মহুয়া লীলাকে পড়িয়ে চলেছে। এখন আর ওর সামান্য দুর্বলতাটুকুও নেই। নিঃসঙ্কোচে ও লীলার সুন্দর মুখের দিকে তাকায় কোন লজ্জা হয় না ওর, নিজেকে

রক্ষা করার জন্য মুখটা মাটির দিকে নীচু করতে হয় না। সহজ স্বাভাবিক ভাবে মহুয়া লীলাকে পড়িয়ে চলে—লীলার রূপের আগুনে মহুয়ার গায়ে তাপ লাগে না, ওর চোখের চাউনিতে মহুয়া লজ্জায় আড়ষ্ট হ'য়ে পড়ে না আর। টেবিলের উপর হ্যারিকেনের আলো জ্বল্‌ছে। মহুয়া শান্ত স্থিরভাবে পড়িয়ে চলেছে। লীলাও পড়ে চলেছে। লীলার দেহের পাপড়ি ফেটে ফেটে উপ্‌ছে পড়ছে, ওর গোলাপের মতো রঙিন রূপ, জ্যোৎস্নার মতো পূর্ণ চাঁদের ঘেরাকে অতিক্রম করে উথলে পড়ছে আলো আকাশ থেকে মাটিতে। কিন্তু মহুয়া ও লীলা দুইই অবিচলিত। সংযম কামনাকে জয় করেছে, দেবত্ব পশুত্বকে হার মানিয়েছে। ক্ষুধা আদর্শের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। পড়িয়ে চলেছে মহুয়া নির্বিকার, পড়ে চলেছে লীলা। বাইরে স্তব্ধ কালো কুটিল অন্ধকার। বাতাস বইছে হু হু করে, একটা দমকা বাতাস ছুটে এলো—গাছের পাতা কাঁপ্‌লো—দরজা, জানালার পর্দা কাঁপ্‌লো, আলো কাঁপ্‌লো—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে নিভে গেল ওটা—হঠাৎ ঘট্‌লো তা। মহুয়ার পায়ের উপর লীলার পায়ের একখানা পাতা ঠেক্‌লো, যেন মহুয়া একখানা হাত বাড়িয়ে লীলাকে চেপে ধরে, লীলা বাধা দেয় না; আরো কাছে টেনে নেয় মহুয়া লীলাকে—লীলা সরে আসে, বুকের মধ্যে টেনে নেয় মহুয়া লীলাকে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে—পৃথিবী অসহায় পুলকে কেঁপে ওঠে—কেঁপে ওঠে পায়ের তলার মাটি—দুরন্ত বাতাসের দোলায় কাঁপে সতেজ শাল গাছ,

কাঁপে ক্ষীণ কোমল মালতী লতা···দুরন্ত বন্যার বেগে স্ফীত নদী কাঁপে আপন গৌরবে—বেগের আবেগকে চেপে ধরে তীরের মাটি কাঁপে আপন পুলকে। মহুয়া মুখখানা সরিয়ে আনে লীলার নরম পাত্‌লা লাল ঠোঁটের কাছে। না থাক্, ক্ষমা করুণ, বাধা দেয় লীলা···নারীর সেই চিরন্তন মামুলী নিষেধ। কিন্তু পৌরুষের কোণায় কোণায় তখন আগুন ধরে গেছে—কে মানে সেই নিষেধ! লীলার টুক্‌টুকে কোমল সুন্দর মুখখানাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে মহুয়া চুমো দেয় অধীর হ'য়ে। আকাশ, বাতাস, মাটি, পাথর কাঁপে···। মহুয়ার আবেষ্টনী ছাড়িয়ে লীলা চ'লে যায় আলোটা জ্বেলে আন্‌তে। অন্ধকার স্তব্ধ ঘরে মহুয়ার বুকের ভিতরে হাতুড়ির ঘা ঘন ঘন পড়তে থাকে। আলো জ্বেলে টলতে টলতে ফিরে আসে লীলা; আবার সেই আলো, সেই সঙ্কোচ, সেই লজ্জা, সম্ভ্রমে মুখ তুলে চাইতে পারে না লীলা। চুপ করে থাকে মহুয়া। বাসায় ফিরবার জন্য উঠে দাঁড়ায় মহুয়া।

'রাত হ'য়ে গেছে, আজ আসি তাহ'লে; রাগ করলে?'

মহুয়া লীলাকে প্রশ্ন করে।

না, লজ্জায় মুখ নামিয়ে লীলা উত্তর দেয়। একটু টুক্‌রো হাসি লীলার চোখে মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেলো।

সামান্য এক টুক্‌রো হাসি হাজার উত্তর দিয়ে হাজার প্রশ্ন করে মিলিয়ে গেলো। প্রতিদানে মহুয়াও হাস্‌লো এমনিতর হাসি।

মনের সমস্ত কামনা এক টুক্‌রো হাসির ঢেউ তুলে বয়ে গেলো। বাসায় ফিরে এসেছে মহুয়া। পুলকে আর আনন্দে ওর

সমস্ত দেহ মন শির্‌শির্‌ করছে, রোমাঞ্চিত 'কণ্টকিত হ'চ্ছে ওর প্রতিটি অণু-পরমাণু। নীতি, সঙ্কোচ, বাধা-নিষেধের বেড়াগুলো অন্তরের পাগলা ঝোরার প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে গেছে—গুঁড়িয়ে চুর্‌চুর হ'য়ে গেছে।

ধীরে ধীরে মহুয়া আর লীলার ভাব হয়। দিনে দিনে দানা বাঁধে ওদের অন্তরের ভালবাসা। ছোটবাবু বুঝতে পেরেছেন এই পরিবর্তন। ভালো লাগেনি ওঁর এই ব্যাপার···মেয়েটা শেষ পর্য্যন্ত একটা রাজবন্দীকে ভালবাসবে—ছন্নছাড়া রাজবন্দী, কি আছে ওদের—টাকা-পয়সা ধন-দৌলত চাকরী-প্রতিপত্তি কোন্‌টা আছে? কিছু নেই যার, তার হাতে তুলে দেবেন মেয়েকে···ভাবতে ভাবতে বিষিয়ে ওঠে ছোটবাবুর মন···ছিঃ, এই এদের সংযম, এদের এই মনুষ্যত্ব, এই আদর্শ, এইটুকু শক্তি নিয়ে দেশের কাজ কর্বে এরা। ঘৃণায় কুঁচকে যায় ছোটবাবুর মুখখানা, ছোটলোক ইতর পশুর চেয়ে নীচ বিশ্বাসঘাতক এই মহুয়া, ভয়ানক দুর্বল, চরিত্রহীন। তাচ্ছিল্যে কুটিল হ'য়ে ওঠে ছোটবাবুর কপালের রেখাগুলো। লোকে কাণাকাণি করে···এক আধটু বিদ্রূপ ভেসে আসে, মহুয়ার গায়ে বিঁধে, কিন্তু লীলা মহুয়াকে আকর্ষণ করে। ছোটবাবু নিষেধ করে দিয়েছেন—একদিন শাসিয়ে বলেছেন—এ বাড়ীতে পা বাড়াবে না মহুয়া, এরপর এ বাড়ীতে ঢুকলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন। গাল দিয়ে বলেছেন···পাজি ছুঁচো জানোয়ার মহুয়াকে। তবু লীলার

চিন্তায় ডুবে আছে মহুয়া—কাঁটার নিষেধের চেয়ে গোলাপের রঙিন পাপড়ির আকর্ষণ ঢের বেশী।

লীলার অবস্থাও তাই। মহুয়াকে ভালবাসে লীলা, এখানে ত নিরুপায়। ওর বাবা-মা যখন জানলেন এই ব্যাপার তখন কি অসহ্য মার। সমস্ত শরীরটা কালশিরে পড়ে গেছে, তবু পারেনি লীলা মহুয়াকে ভুলে যেতে।

ভালবাসা নিঃস্ব, দীন, ভিখারী মানে না, বিচার করে দেখে না কে মুক্ত আর কেই বা বন্দী।

* * * *

'মহুয়াদা, মহুয়াদা,' নিঝুম রাতের অন্ধকারে লীলা মহুয়াকে ডাকছে।

বিস্মিত মহুয়া উদ্বিগ্ন হ'য়ে বলে—ছিঃ, এত রাতে।

—ভয় পাওনি ত ?

—না, আলোকেই ভয় পাই, অন্ধকারকে ভয় করি না, ভালবাসি একে, এরই অপেক্ষায় বসে থাকি। নিঃসঙ্কোচে কথা বলে যায় লীলা। গভীর রাতের অন্ধকারে মহুয়ার বুকে লীলা। ঘন অন্ধকারে কালো আকাশ মাটিকে ছোঁয়, মাটি আকাশ এক হ'য়ে যায়।

—তুমি কেন বন্দী মহুয়াদা ?

—আর তুমি কেন বন্দী নও লীলা ?

—কে বলে আমি বন্দী নই মহুয়াদা ?

—হ্যাঁ তুমিও বন্দী—বন্দীর বন্দিনী।

নিবিড় অন্ধকারে মহুয়া লীলাকে চেপে ধরে, রাত যেমন করে ছেয়ে রেখেছে মাটিকে।

*　　*　　*　　*

...দিন যায়। আবার অন্ধকারে লীলা মহুয়ার ঘরে ঢোকে। ভীত শঙ্কিত লীলা—শুনেছ মহুয়াদা বিপদের কথা? অস্ফুট ভাঙা গলায় লীলা জানায়।

কৈ না'ত, কি বিপদ? মহুয়া উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করে। আমার পেটে তোমার—। আর বল্‌তে পারে না লীলা। মহুয়ায় মুখখানা পাথর হ'য়ে যায়। ভাবনার রাশগুলো দুঃস্বপ্নের মতো ওর কণ্ঠ চেপে ধরে। সে কি? সে কি? সমাজ, আইন, লোক-নিন্দে, কতো ভয়-সঙ্কোচ মহুয়ার মনে ভিড় করে। কি হ'বে, কি হ'বে—মহুয়ার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো যেন! সহসা একটা কুটিল বাঁকা হাসি মহুয়ার চোখে মুখে খেলে যায়...হায়নার মতো ক্রুর সে হাসি। মহুয়ার কোলে মাথা রেখে লীলা ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে—'ওগো তুমি বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।' একজন ডুবন্ত মানুষ আর একজন ডুবন্ত মানুষকে ধরে বাঁচতে চাইছে।

*　　*　　*　　*

কয়েকদিন পরের কথা। ঝড়ের মতো বেগে মহুয়ার ঘরে ঢুকলেন ছোটবাবু—'ছোটলোক, পাজি, ছুঁচো'—দাঁতে দাঁত ঘষছেন ছোটবাবু। এরই জন্যে ভিজে বিড়াল, এরই জন্যে শয়তান উপকার করতে চেয়েছিলি...রাগে টগ্‌বগ্‌

করছেন ছোটবাবু। পাজি, দেশ-প্রেমিক, জুতিয়ে চামড়া তুলে দেবো হারামজাদা—দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন তিনি —লোকের কাছে মুখ দেখানো যাবে না···আমার ইজ্জৎ নষ্ট করলি ছুঁচো—ইজ্জৎ-ভয়ে কাঁপছেন ছোটবাবু।

কাঠের মতো স্তব্ধ মহুয়া, কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতে পারে নি। আচ্ছা, দেখে নেবো হারামজাদা—ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো গর্জাতে গর্জাতে ছোটবাবু ঝড়ের বেগে বের হ'য়ে গেলেন।

গভীর রাতের অন্ধকারে পা টিপে টিপে লীলা আসে মহুয়ার ঘরে। মহুয়াদা—অস্ফুট কণ্ঠের চাপা আওয়াজ।

ধীরে ধীরে মহুয়া লীলাকে দোর খুলে দেয়। 'আবার এলে? নিজেকে এইভাবে নষ্ট করছো কেন বলত? যাও ফিরে যাও, যাও বলছি এক্ষুণি, চলে যাও, আমি গরীব, আমি বন্দী'—বেদনার্ত মহুয়ার কণ্ঠস্বর।

—'আর আমি বুঝি বড়লোক, আমি বুঝি মুক্ত···আমি কি কিছু সইনি।' মহুয়া লীলাকে কাছে টেনে নেয়। ওর সারা গায়ে জুতো আর চাবুকের দাগ···অন্ধকারে দেখা গেলোনি, কিন্তু বোঝা গেলো বেদনার পরিমাণ। 'ওঃ' লীলাকে বুকে চেপে ধরে মহুয়া।

'কি হ'বে মহুয়াদা, কি উপায় হ'বে, একটা কিছু উপায় কর?'

সে হ'বেখন। একটা কুটিল বাঁকা হাসি অন্ধকারে ফুটেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

ওগো তুমি বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো লীলা।

আর এক রাতের ঘন অন্ধকারে আবার ওরা মিলিত হয়। অসহায় নারী পুরুষের বুকে আশ্রয় খোঁজে। প্রস্তুত হ'য়ে আছে মহুয়া—ভয় নাই, এই নাও'—পকেট থেকে দু'টো পুরিয়া বের করেই অন্ধকারে মহুয়া লীলার হাতে দেয়। অন্ধকারে কারো মুখের ভাবটা ধরা গেলোনি—গভীর অন্ধকারে কুমারী মায়ের অসহায় মাতৃত্ব মুখ লুকোয়, আশ্রয় পায়···কিন্তু অন্ধকারের পরেই আছে আলো—পশুত্বের পরে আছে সভ্যতা···রাতের অন্ধকারের শেষে ঐ আলো অপেক্ষা করছে···ওর কাছে মুখ দেখাতে হ'বে, ওর কাছে দাঁড়াতে হ'বে···সমাজের বুকে সভ্যতার মধ্যে নিঃসঙ্কোচ চলার পথ পেতে হ'বে।

ভ্রূণকে হত্যার আয়োজন করে মহুয়া আর লীলা—বাপ্‌ আর মা। অসহায় মাংসপিণ্ড নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে। একবার যন্ত্রণায় গোঙায় লীলা, তারপর বাস্‌ সব ঠিক হ'য়ে গেছে। অন্ধকারে মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলে মহুয়া ঐ মাংসপিণ্ডটাকে—লীলার রক্ত লাগা কাপড়-গুলোকে। যে অসহায়কে মাও উপেক্ষা করে, মাটিই তাকে আপন করে নেয়—মাতৃবক্ষে যার স্থান হ'লোনি, মাটির বুকে সে নিশ্চিন্ত হয়। অন্ধকার আকাশে যে তারাগুলো নিঃসঙ্কোচে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছিল দিনের আলোর স্পর্শে ম্লান

হ'য়ে তারা অন্তর্হিত হয়। সকাল হয়···সভ্যতার সকাল রাতের অন্ধকারে বর্বরতার সব আবর্জনা সরিয়ে দিয়ে নিঃসঙ্কোচে চলে সভ্যতার বিজয় রথ।

*   *

অনেক দিন পরের কথা। মহুয়া মুক্তিলাভ করে লীলাকে বিয়ে করেছে। কলকাতায় একটা চাকরী নিয়েছে মহুয়া, আর তাই ওদের দিন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কেটে যাচ্ছে— ওদের লঘুদিনগুলি পালহীন ছোট্ট নৌকার মতো— সিনেমায়, পার্কে, হাওড়ার ব্রিজে হাওয়া খেয়ে আর বেড়িয়ে কপোত-কপোতীর মতো আনন্দে কেটে যাচ্ছে। চাকরীর টাকায় ওদের বেশ কুলিয়ে যায় তাই অধিকাংশ টাকাটাই সভ্যতার রুচিকর প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। এমনিতর একদিনে নিঃসঙ্কোচে মহুয়ার কানে কানে লীলা বলে গুটি দুই কথা। পুলকে শিউরে ওঠে মহুয়ার অন্তর। বাঃ, সে বাবা হ'বে একটি শিশুর—বুকে চেপে ধরে অসংখ্য চুমোয় ভরে দেয় লীলার রাঙা মুখের টোলগুলো। লজ্জায় আরক্ত লীলা প্রশ্ন করে—হাঁ গো কি ব্যবস্থা কর্বে? আবেগে ঝরে ঝরে পড়ে লীলার কথাগুলো।

'আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে হয় না, এই সময়টা ওখানেই বেশ নিরাপদ।'

পরে বুঝে বল্‌বো। সে দেখা যাবে এখন, তোমাকে উদ্বিগ্ন হ'তে হবে না।

কিছুদিন পরে লীলা ওর মাকে পত্র দিয়েছে।

শ্রীচরণকমলেষু

মা, আপনারা আমার সংখ্যাতীত সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। উপস্থিত আমার শরীর খারাপ হইয়াছে এই সময়টা আপনাদের কাছে থাকিতে মন যায়, কেমন জানি ভয় ভয় করিতেছে। ছোট ভাই-বোনদের আমার স্নেহাশীষ জানাইবেন। পত্র দিবেন। আমরা ভাল আছি।

ইতি

আপনাদের

স্নেহের লীলা।

উত্তরও যথাসময়ে আসিয়াছে।

সাবিত্রী সমানেষু,

মা লীলা আমাদেরও ইচ্ছা তুমি এই সময়টা চলিয়া আসিবে। বাবুরও সেই ইচ্ছা, তিনি ভয় কাতুরে মানুষ তোমাদের জন্যই সংসার। জামাইবাবুর মত লইবা,... তোমরা আমাদের আশীর্ব্বাদ জানিবা। পত্র দিবা।

ইতি

আঃ—'মা'

কিছুদিন পরে মহুয়ার মত লইয়া লীলা বাপের বাড়ী গিয়াছে। যাবার সময় মহুয়া কত জিনিষই না কিনিয়া দিয়াছে, সাবধানে থাকিবার জন্য কত উপদেশ দিয়াছে।

লীলাও মহুয়ার হাতে ধরিয়া বলিয়াছে—ওগো তুমি যাবে, যাবে কিন্তু লক্ষ্মীটি। মহুয়াও আবেগে ঝরে পড়ে বলেছে—যাব, নিশ্চয়ই যাব, কোন চিন্তা নেই তোমার।

* * * * *

খোকা নির্দিষ্ট দিনে জন্মলাভ করেছে। আজ তার অন্নপ্রাসনের তারিখ···খোকাকে ভাত খাওনোর আয়োজন হ'য়েছে। লীলার ভাই মণ্টু খোকনের মুখে ভাত দেবে। ছুটি নিয়ে মহুয়া শ্বশুর বাড়ী এসেছে সঙ্গে এনেছে হ'রেক রকমের জিনিষ। ছোট হাফ্ সাট, সিল্কের প্যাণ্ট, জরীর টুপি, মখমলের জুতো পরান হ'য়েছে খোকনকে। সুগোল সুন্দর শিশু···মহুয়া ও লীলার খোকন। ভাতের থালা সাজানো বত্রিশ ব্যঞ্জনসহকারে, পাশে ধানের আড়ি. টাকা, কলম, দোয়াত। ছোট্ট খোকন হাত দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে ভাতগুলো, ধানগুলোকে মুঠো মুঠো করে ধরছে—কলমটাকে ধরে মুখে তুল্‌তে যাচ্ছে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন লীলার বাবা, মা, ভাই বোনেরা, মহুয়া আর লীলা।

—'দেখো বাবা, তোমার ব্যাটার কাণ্ড দেখো, সব ধরছে ও টাকা, ধান, কলম···দেখে নিয়ো নাতি আমার লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র হ'বে'। মহুয়াকে উদ্দেশ করে কথাগুলো বল্লেন লীলার মা।

মহুয়া আর লীলার মুখ চোখে একটি উদ্ভাসিত হাসির

ছোট রেখা। চোখের কোণায় ছোট ছোট অশ্রুবিন্দু আনন্দে মোমের মত গলে গলে পড়ছে।

* * * *

'এবার আমরা ফিরে যাবো বাবা'— মহুয়া শ্বশুরকে বলে। —"তা যাও, ওতে আর আমাদের কী বাবা, তবে আরো দু'দিন থাকলে লীলার শরীরটা আর একটু সারতো? তবে তোমার জিনিষ তুমি নিয়ে যাবে এতে আমাদের আর কি থাকতে পারে?'—মহুয়ার শ্বশুর ম'শায় উত্তরে বল্লেন।

'তোমরা যাও বাবা, আমি কিন্তু তোমার ব্যাটাকে ছেড়ে দিচ্ছিনে বাবু—এই ছ'মাস ধরে ওকে বুকে পিঠে করে বেড়িয়েছি, ওকে ছেড়ে থাকতে'...লীলার মায়ের চোখ বেয়ে জল পড়লো।

বিদায়ের পালা শেষ হ'লো। মহুয়া ও লীলা খোকনকে কোলে নিয়ে কল্‌কাতার বাসায় ফিরে এসেছে। লীলার মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসা উপ্‌ছে পড়তে চায়। একটিমাত্র ছোট শিশুকে ঘিরে মাতৃ-হৃদয়ের হাজারো রকম বাসনা কল্পনার রঙিন জাল বোনে।—লীলা ভাবে বড় হ'বে খোকন, স্কুলে যাবে—ছোট্ট স্মার্ট খোকন—পাশ কর্বে ম্যাট্রিক, আই. এ, বি. এ, এম. এ, ডেপুটি কালেক্টর হ'বে খোকন—না, না, মনের মত হয় না। সুভাষ, জহরলালের মতো বড় হ'বে। লীলা খোকনের নাম রাখে চিত্ত। চিত্তরঞ্জনের মত দেশ-বিখ্যাত দানবীর হ'বে, শুধু তাই নয় জহরলালের মত পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী, সাহসী,

হ'বে না, না আরো কিছু—নেতাজীর মত দুঃসাহসী, নির্ভীক, তেজস্বী হ'বে। রাজবন্দী মহুয়ার ছেলে, লীলার ছেলে বড় হ'বে···লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র হ'বে—মাতৃহৃদয়ের কামনা একটিমাত্র খোকনকে নিয়ে রামধনুর মতো শতরূপে বিচ্ছুরিত হয়। ফেনিল হ'য়ে ওঠে তরঙ্গে তরঙ্গে মাতৃহৃদয়ের কল্পনা ছোট্ট খোকনকে নিয়ে। অবচেতন মনের তল থেকে মনের কোন নিভৃত অন্ধকার চোর কুঠ্‌রী হ'তে অস্পষ্ট রক্তাক্ত শিশুমূর্তি উঁকি মারে—অস্ফুট নীরব ভাষায় মাতৃহৃদয়ের মমতার দ্বারে আঘাত করছে যেন—'উঃ' একটা কাতর শব্দ লীলার বুকের অন্তরতম স্থান থেকে বের হ'য়ে আসে। ওর মাতৃহৃদয়ে কাঁপন লাগে 'ষাট্ ষাট্' খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে লীলা। একটা দুঃস্বপ্ন বুদ্‌বুদের মতই উঠেই মিলিয়ে যায়।

ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর গহনা গড়ায় লীলা খোকনের জন্যে মহুয়ার কাছে নানা জিনিষের আবদার করে—পূরণও করে মহুয়া। ক্ষুদ্র সংসার অভাব অল্প অভিযোগ অকিঞ্চিৎকর ভালবাসার ছোট্ট একটি নদী ঝির্ ঝির্ করে বয়ে চলেছে—এর স্পর্শে সামান্য তৃণও প্রাণ পায়—সজীব ও সবুজ হয়।

* * * * * *

দেশের মধ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হ'য়েছে···যুদ্ধে ক্লান্ত ব্রিটিশ ছেড়ে যাবে ভারতবর্ষ—ছেড়ে দেবে ভারতবাসীদের হাতে তাদের স্বায়ত্তশাসনের ভার—তারি গুরু দায়িত্ব। সহসা আগুন জ্বলে ওঠে ভ্রাতৃ-হৃদয়ে—আজাদীর হিস্যা নিয়ে। ভাগ

করে নেবে এই স্বাধীনতা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে। প্রশ্ন ওঠে স্বাধীনতা কি ভাগ করা যায়? নিজেরই দেশের স্বাধীনতা ভাগ না করে কি ভোগ করা যায় না? যে অমূল্য সম্পদ জাতীয় একতায় প্রতিষ্ঠিত, যে কোহিনূর হিন্দু-মুসলীম বহু শহীদের খুনে লাভ হ'য়েছে তা ভাগ করে নিতে হ'বে? স্বাধীনতা যে একতার মধ্যেই মিলে, একতার মধ্যেই যে তা রক্ষিত হয়। তবু ভাগ করে নিতে হ'বে···যেমন করে একই সংসারের হাড়ি কুড়ি বাসন পত্তর কাঁথা বালিস ভায়ে ভায়ে ভাগ হয়, তেমনি করেই ভাগ হ'বে জাতীয় সম্পত্তি। যেন অভিভাবকহীন হ'তে চলেছে ওরা তাই তাদের আর মিলে থাকা চল্‌বে না। ভাগ চাইই চাই, আজাদীর হিস্যা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে একে অন্যের কাছ থেকে। স্বার্থান্বেষী মানুষ খোঁজে এই বিবাদের সুযোগ। গোপন বৈঠক চলে হিন্দুর, গোপন বৈঠক চলে মুসলমানের। একে অন্যকে হিংসার চোখে দেখে। শত শত বছর যারা একই আকাশের নীচে একই মাটির বুকে গলাগলি করেছিল আজ তারাই একে অন্যকে হনন্ করার জন্য তৈরী হয়। যে প্রতিবেশী বিপদে সম্পদে বুক দিয়ে পরস্পরকে আগ্‌লে থাকতো আজ তারা মারমুখী। যে ভাই ছোট ভাইয়ের মুখে নিজেরি বিস্কুটের আধখানা তুলে দিয়েছে আজ সেই আঘাত কর্বে তাকে। ভ্রাতৃ-রক্ত পাতের নির্দিষ্ট দিন এগিয়ে আসে। এই জগতের নিয়ম—এই নিয়েই কুরুক্ষেত্র বিশ্ব মহাযুদ্ধ—।

উন্মত্ত মানুষ পশুর মতো উল্লসিত হয় আদিমকালের

মত নখ ও দন্ত শানায়। ভাগ চাই ভাগ চাই…কেড়ে নেবে টানাটানি হানাহানি কর্বে ওরা পরস্পর। লেলিহান হিংসার আগুন ধক্ ধক্ করে জ্বলে। বুভুক্ষ মানুষের দল নিজেদেরই হাড় মাংস খাবার লালসায় লোলুপ হ'য়ে ওঠে। শুষ্ক হাড় নিয়ে শ্মশানে কুকুর নিজেরই মুখের রক্তের স্বাদ পেয়ে মেতে ওঠে। ওৎ পেতে আছে মুনাফাকারীর দল। সুযোগ এসেছে যে লাঠি ওদেরই মাথা ভাঙতো তাই উঁচিয়ে এরা পরস্পরের দিকে ছুটে যায়। সোরাবের নেশায় মত্ত বুভুক্ষ দল ক্ষেপে ওঠে। সাধারণ মানুষ নগণ্য তুচ্ছ উলুখড় ধ্বংসের আগ্রহ নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে। সোরাবের মাতলামী আজ ওদের দেহে মনে। মার্ মার্ কাট্ কাট্ শব্দে বের হয় উন্মত্ত জনতা—বুভুক্ষ মানুষের ক্ষেপাদল লুট, পাট, আগুন ধরিয়ে দেওয়া, হত্যা…মানুষের তাজা রক্তপাতে উন্মত্ত মানুষ বঞ্চিত মানুষ প্রতিশোধ নেয় কিন্তু কার উপর? নিজেদেরই অন্তরের জ্বালা ওরা নিজেদেরই বুক আঁচড়ে মেটাতে চায়, মদে মাতাল যেমন ক'রে মাতলামীর ঘোরে নিজেরি মাথা ঠোকে। মহানগরী জ্বল্‌তে থাকে…মেয়েদের লুট করে নিয়ে যায়… ছেলেদের হত্যা করে, নিরীহ মানুষকে খুন করে।

আতঙ্কে শিউরে ওঠে লীলা, মহুয়াকে বারণ করে—'ওগো তুমি আজ আর অফিসে যেও না আমার বড্ড ভয় করছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে লীলা। চল এখান থেকে কোথাও চলে যাই—কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করি।'

—কিন্তু পেটও পাড়াগাঁয়েও যাবে, খাবে কি···কোথায় বা যাবে—উদাসভাবে মহুয়া উত্তর দেয়।

'জীবনের চেয়ে কি চাকরী দামী ?' ক্ষোভের সঙ্গে লীলা বলে।

'তা নয়, কিন্তু জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই ত চাকরী।' নিরুপায় মানুষ বিশ্বের কত শক্তিকে জয় করেছে···কত অসাধ্য সাধন করেছে···কিন্তু পেটের কাছে হার মেনেছে।

দরজায় খিল দিয়ে থাকো, আমি এখনি আস্‌ছি অন্ততঃ কিছুদিনের ছুটি নিইগে···ভগবানকে ডাকো, তিনি আছেন··· লীলাকে সাবধান করে মহুয়া বেরিয়ে যায়।

বেলা বাড়ে। বারোটা পেরিয়ে ১টা বাজে, উন্মত্ত জনতা এগিয়ে আসে। আল্লা-হো-আক্‌বর—মার্ মার্ কাট্ কাট্ ওরই প্রতিশব্দ হর হর মহাদেও, একে অন্যকে হানবার জন্য ছুটে আসে। আকাশে ভেসে ওঠে নিরীহ মানুষের আর্ত্তনাদ। লীলা ভয়ে মুখ ঢাকে—রক্ষা কর হে ভগবান, হে মা কালী, রক্ষা কর, রক্ষা কর মা দুর্গা, বাবা সত্যপীর। ওরা আছ্‌ড়ে মারছে শিশুদের, ওদেরই দেশের ভবিষ্যৎকে ওরা ওদের পায়ের তলায় পিষে ফেল্‌ছে, ওদের ক্ষেতের অঙ্কুর যা বাড়তো যা সোনার ফসলে পরিণত হোত তাই ওরা পা দিয়ে দলে থেঁৎলে যাচ্ছে। পশুর মতো ওর টুঁটি কামড়ে ধরছে—ইট্, পাটকেল, লাঠি, তলোয়ার, ছোরা—প্রেতের তাণ্ডব, প্রেতের উল্লাস···বীভৎস ভয়াবহ—রক্ত, মাংস, মজ্জা—চাপ-চাপ লাল-লাল কালো-কালো হ'য়ে জমা

হ'চ্ছে পথের মাটিতে। লীলা ভয়ে ম্লান, বিবর্ণ...চিত্তকে বুকে চেপে ধরে কাঁপছে, মহাপ্রলয়ের ঝড় উঠেছে, ক্ষুদ্র লতা তার বুকের বোঁটার একটি সুন্দর ছোট রঙিন ফুলকে আটকে রাখতে চাইছে প্রাণপণ মমতায়। হা-হা-হা, হো-হো-হো বিকট উল্লাস নেশায় মত্ত মানুষ পৈশাচিক মূর্তি নিয়ে ছুটে আসছে। ঐ, ঐ আরো কাছে, আরো আরো—দুর্গা দুর্গা, ভগবান, বাবা সত্যপীর, নারীর অস্ফুট কাতর প্রার্থনা, অসহায় মানুষের করুণ কাতর মিনতি দেবতার কাছে অন্তরের ভগবানের কাছে কাতরভাবে আহ্বান করছে মানুষ। পশু-শক্তির কাছে নিতান্ত অসহায় মানুষ, যুগে যুগে এরি সাধনা করছে। লীলা স্তব্ধ পাথরের মতো আড়ষ্ট। ঐ দরজায় ঘা দিচ্ছে—মড়্ মড়্ মড়্ দরজা ভেঙে পড়লো, তালের পাতার মতো কাঁপছে লীলা, অসহায় নারী ছেলেটাকে বুকে ধরে। ওদের একজন ছিনিয়ে নেয় ওটাকে—মেঝের উপর আছড়ে মারলো ওটাকে—'উঃ' যন্ত্রণায় ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল লীলার বুক...কাঠের মত শুষ্ক নিশ্চল লীলা...উন্মাদের দল এগিয়ে এলো—হো-হো সুন্দরী, খাসা মাল, এই বে লে লে দেখ্ দেখ্। ওকে পাঁজা-কোলে করলো ওদের চার পাঁচজন, ভয়ে বেদনায় লজ্জায় লীলার চোখ দু'টো বন্ধ হ'য়ে গেছে, কানে কিছুই শোনা যাচ্ছে না—বিমলিন পাংশু পৃথিবীটা অন্ধকারের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে যেন, সভ্যতার বৈদ্যুতিক আলো নিভে যাচ্ছে, আকাশ বাতাস ছেয়ে ভয়াবহ, কালো কুটিল মেঘ জমেছে।

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ফিরে এসেছে মহুয়া···রাস্তায় ভয়ে ভয়ে আস্‌ছে···অসংখ্য মানুষের-বীভৎস দেহ, রক্ত, মাংস—শেয়াল কুকুর গুলোর উল্লসিত চীৎকার···দ্রুত বাসার দিকে ছুটে চলে মহুয়া উর্দ্ধশ্বাসে—কে একজন দূরে কাঁদছে, হয়ত সব হারিয়েছে—হয়ত পথের ভিখারী হ'য়েছে, হয়ত আরো বেশী···ঝড়ের পরে সব লণ্ড ভণ্ড হ'য়ে গেছে···যে সম্পদ তিলে তিলে তাল হয়েছিল—কত ত্যাগ, কষ্ট, দুঃখ ভোগে যা গড়ে উঠেছিল—কত ঠকা-জিতায় লাভ-লোকসানে গড়ে উঠেছিল তাই তছনছ হ'য়ে গেলো—যে দেহ দিনে দিনে একটু একটু করে বেড়েছিল রক্তে, মাংসে, হাড়ে, মজ্জায়, মেদে প্রবল দ্বীপের মতো বড় হয়েছিল তা নষ্ট হ'য়ে গেলো, বহু জন্মের বহু পুরুষের সঞ্চয় এক নিমেষে মাটিতে মিশে গেলো। মহুয়া বাসায় ফিরে এসেছে কিন্তু লীলা কৈ? খোকন কৈ? একি এই অবস্থা! এতদিনের গড়ে তোলা সংসারের এই অবস্থা! লীলা লীলা কৈ? কৈ মহুয়ার খোকন? আর্ত্তনাদ করে ওঠে মহুয়া—ঐ যে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে একটা থেঁৎলে যাওয়া একটা কচি মাংসপিণ্ড—এই যে সানের উপর আঠার মত চট্‌ চট্‌ করছে এই যে কালো কালো তরল পদার্থ এগুলো কি? 'ওঃ'! মহুয়ার বুকটা ফেটে যেতে চায়, হৃৎপিণ্ডটা চৌচির হ'য়ে ছিঁড়ে বের হ'তে চায়। খোকা, বাবা আমার, খোকা আমার—লীলী, লীলা কৈ? প্রতিশোধ নেবে মহুয়া, পিশাচদের শাস্তি দেবে, উন্মাদের মতো মহুয়া ছট্‌ফট্‌ করে একবার আপন মনেই হেসে উঠে—হা-হা-হা এই নিয়তি, হা

ভগবান ! কৈ কোথায় ভগবান—ভগবান নেই, মিথ্যে এই দেবতা, মিথ্যে এই ঠাকুর। কালা পাহাড়ের মতো ধ্বংস কর্বে মহুয়া এই সংসার। হা-হা-হা, উন্মাদের মতো হাস্‌লো মহুয়া খোকার থেঁৎলে যাওয়া মাংসপিণ্ডটা বুকেরমধ্যে চেপে ধরে। হো-হো-হো করে কাঁদ্‌লো মহুয়া—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদ্‌লো। আল্লা-হো-আকবর, হর হর মহাদেও, মার্ মার্-কাট্ কাট্, হো-হো-হো-দেবতার নাম নিয়ে পৈশাচিক তাণ্ডবে মত্ত মানুষ। ভয় পায় মহুয়া, ছুটে বের হ'য়ে যায় ঘর থেকে।

রাস্তার গলিতে একটা কালো যোয়ান গুণ্ডা ছোরা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কে, কে যায় ? লোকটা চীৎকার করে ওঠে। ভয় পায় মহুয়া, খরগোসের মত ছুটে পালায়।

আবার পথ চল্‌ছে মহুয়া, ভাবতে ভাবতে চলেছে—সব পুড়ে গেল, সব ছিঁড়ে গেল, তবু বেঁচে আছি। পাগলা ক্ষেপা কুকুরের মতো রাস্তায় রাস্তায় ছুটে চলেছে মহুয়া—এই একটা ট্রাম আস্‌ছে মহুয়া, ছুটে গিয়ে ওটায় চেপে বসে—কৈ লীলা ? নাই ত। নেমে যায়। আবার একটা বাস—আবার চেপে বসে আবার নামে—আবার একটা ট্রাম—কৈ লীলা, লীলা কোথায় ? একটা রিক্সা আস্‌ছে, চুপ করে দাঁড়ায়, পর্দার আড়ালের ফাঁক দিয়ে উকি মারে—কৈ লীলা, কোথায়, কে দেবে লীলার সন্ধান ?

দূরে দূরে কতকগুলো ঘর জ্বল্‌ছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাল্লা করছে অনেকগুলো মানুষ······মার্ মার্ কাট্ কাট্ শব্দ, মারো

ব্যাটাদের, কোতল কর শালাদের—নিরীহ মানুষকে খুন করেছে ওরা। মুসলমান পাড়ায় হিন্দু গুণ্ডারা আগুন দিয়েছে, সঙ্গে যোগ দিয়েছে অসংখ্য জনসাধারণ। মহুয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ঘরগুলো পুড়ে ছাই হচ্ছে, ভেসে আসছে আর্ত্ত মানুষের চীৎকার, নারীর ব্যাকুল আর্ত্তনাদ। প্রকাশ্য দিবালোকে একটা নারীর উপর অত্যাচার করছে দশ বারোটা গুণ্ডা··· হো-হো-হো, মদ খেয়ে মাতাল হ'য়েছে ওরা···মহুয়া ভাবছে পশু, পশু সবই পশু। কতকগুলো কুকুর একটা পচা মড়া নিয়ে টানাটানি করছে। মহুয়া হাততালি দিচ্ছে— বাঃ বাঃ সব শালা পশু···নরকের কীট। মেয়েটার উপর অত্যাচারের পর গুণ্ডাগুলো একটা ছোরা বসিয়ে দিলে ওর বুকে···ঐ আবার আর দু'টো মেয়েকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে···লুফোলুফি করছে ওদের বিবস্ত্র করে দিয়ে—অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে—ক্যায়াবাৎ ক্যায়াবাৎ, খাসা মাল—খাসা···। গোটাকতক ছোটছেলেকে সারি দিশে দাঁড় করিয়ে একটার পর একটা ধরে আছড়ে মারছে। রক্ত স্নান করছে মত্ত মানুষ, প্রতিশোধ নিচ্ছে পরস্পরকে কামড়ে ছিঁড়ে। আরো কতকগুলো ঘর জ্বলছে···ঐ ঐ আগুনের টকটকে শিখা আকাশকে স্পর্শো করলো, জোরে বাতাস বইছে—আগুনের শিখাও লক্ লক্ করে উঠছে। পুড়িয়ে দাও, সব পুড়িয়ে দাও বাবা অগ্নি দেবতা—সব ছাই করে দাও, কেউ যেন রক্ষা না পায়—মহুয়া আপন মনেই পাগলের মতই বলে চলেছে।

মহুয়া দৌড়ে যায়। ক্ষ্যাপার মতো···মহানগরী ছাড়িয়ে কিন্তু সর্বত্রই তাই, সব পুড়ছে—ডক্, জেটি, মিল, কারখানা, বাড়ীঘর, স্কুল, কলেজ, আটচালা, পাঠশালা, প্রাসাদ, কুটির—সবজায়গা থেকেই ভেসে আস্‌ছে সব-হারানোর বিলাপ···সব ক্ষয়ে যাচ্ছে। গ্রাম, নগর, জনপদ সব পুড়ে গেলো। মনুষের সভ্যতার সব সম্পদ লক্ লক্ লক্ হিংসার ক্রূর আগুনের শিখা একের পর এক সব ছাই করে দিচ্ছে—মন্দির, মস্‌জিদ, সবই যাচ্ছে। কাউকে বাদ দিচ্ছে না ওরা, এক পক্ষ অন্য পক্ষের শিশু, নারী, বৃদ্ধ, যুবক সকলকেই থেঁৎলে মারছে—রক্তের ঢল বয়ে গঙ্গার ঘাটে নামছে, পচা মড়াগুলো শেয়াল-কুকুরে খেয়ে খেয়ে ওদেরও অরুচি ধরে গেছে।

মহুয়া ষ্টেশনে আসে। গ্রাম ছাড়া দেশ ছাড়া লোক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে···ম্লান মুখ, বিবর্ণ চোখ, কালো পাংশু চেহারা··· শূন্য হ'য়ে আস্‌ছে ওরা···সাহায্য চাই, খাবার চাই, পরবার চাই, থাকার নূতন আশ্রয় চাই···সব হারিয়ে পথে পথে ঘুরছে অগণিত বুভুক্ষু মানুষ—কোটী কোটী মানুষ···কে দেবে সাহায্য। এই স্বাধীনতার পরিণাম,—এই স্বাধীনতার জন্য দেশের এত শহীদ অকাতরে জীবন দান করেছে? এই স্বাধীনতা, যার জন্য এত মা চোখের জল ফেলেছে. এই স্বাধীনতা যার জন্য বীরের তাজা রক্তপাত ঘটেছে? এরি জন্য এত লোক ফাঁসী গেলো, গুলীর মুখে প্রাণ দিলো? ভাবতে ভাবতে অধীর হ'য়ে যায় মহুয়া। সারাজীবন যে আজাদীর স্বপ্ন

দেখলো কোটি কোটি মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে—এই তার রূপ? ম্লান বিবর্ণ দেশমাতৃকা…শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি, সম্পদ, স্বাস্থ্য, বীর্য্য, সম্মান, মনুষ্যত্ব সব দুর্বার পশুর-প্রবাহে ভেসে গেলো। জীর্ণ-শীণ, পত্রহীন, পুষ্পহীন, বৃন্তহীন, ডাল-পালাহীন শুধু একটা সর্ব্বহারা চেহারা। সব গেছে, দেশ তার সব হারিয়েছে…অসংখ্য সর্ব্বহারাকে বুকে নিয়ে কাঁদছে। মহুয়া ভাবছে আকাশ বাতাস কত কিছু? পথ চলে মহুয়া। শ্রান্ত, অবসন্ন দেহ মুখচোখ গুলো বসে গেছে, কালি জমেছে—চোয়ালের দু'পাশে, চোখের ঘেরায় ঘেরায় আর কপালের কোঁচ গুলোতে। ঐ আবার চীৎকার, ঐ ঐ আগুন, বোমা, ছুরি, তলোয়ার, মশাল, ইট, পাটকেল, লাঠি—হানাহানি, কাটাকাটি, তৃণও জ্বলে যাবে এ আগুনে। পোড়ামাটি পোড়ামাটি—মাটিকেও পুড়িয়ে দেবে। কারো পরিত্রাণ নেই …ভবিষ্যতের আশাও নেই। একটা লোক এগিয়ে আসছে মহুয়ার দিকে, দিগবিদিগকজ্ঞানশূন্য মহুয়া ছুটছে—ছুটছে ঐ এলো এলো যম—সাক্ষাৎ মৃত্যু আসছে—সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার ম্লান বিবর্ণ ধোঁয়াটে হ'য়ে মিলিয়ে আসছে। কে বলে পৃথিবী সৌন্দর্য্যময়ী, ঐশ্বর্য্যময়ী, রূপসী, একটা কঙ্কাল, একটা নরক এই পৃথিবী,—মহুয়া সব হারিয়েছে।

* * * *

জ্ঞান যখন হ'লো তখন মহুয়া দেখছে একটা রেডক্রশ ট্রাকের উপর রয়েছে ও। কতকগুলো স্কুলের ছেলে যাচ্ছে

রিফিউজী ক্যাম্পে। ভয়ে ভয়ে তাকায় মহুয়া। তাহ'লে শেষ হয়নি ওর। ঐ আকাশে সূর্যের লাল্চে আলো হাস্ছে, ভোরের ফুর্ ফুরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে···মহুয়ার কেন জানি আনন্দ হয়। উঠে বসে মহুয়া। ওদের প্রশ্ন ক'রে বলে

—কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?

—রিফিউজী ক্যাম্পে।

তোমরা কেন যাচ্ছ ওখানে, কি কাজ তোমাদের ?

কেন আবার, বাস্তুহারাদের সামান্য এক আধটু সেবা করতে। আমাদের টিফিন পাওয়ার টাকাগুলো আমরা সবাই মিলে ওদের দিচ্ছি। যতদিন দেশের এই তুর্দ্দশা চল্বে আমাদের ভাই-বোনদের কষ্ট থাক্বে, ততদিন কি করে মুখে রুচ্বে বলুন ত ?

মহুয়া দেখে ওরি দেশের কচি কচি ছেলেরা যারা এক সকাল খেতে না পেলে মুষড়ে যায়, ম্লান হ'য়ে যায় আজ তারাই তাদের আহার্যের অংশ সর্বহারা ভাই-বোনদের মুখে তুলে দিচ্ছে। মহুয়া আবার আলো দেখতে পায়, কিন্তু ক্ষীণ সে আলো—ঘন অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ক্ষীণ বিত্যুৎ-দীপ্তির মতো—যা মুহূর্ত্তে প্রকাশ পেয়েই মুহূর্ত্তেই মিলিয়ে যায় তেমনি। ভাবতে ভাবতে চলেছে মহুয়া জীবনের আজাদীর স্বপ্ন। স্বপ্ন তাহ'লে কি সত্য হ'বে, আস্বে কি সে স্বাধীনতা—মানুষের পরিপূর্ণ বন্ধন-মুক্তি ? আপন মনেই প্রশ্ন করলো মহুয়া। একটি ছোট্ট ছেলে আর একটি বড় ছেলেকে নাড়া দিয়ে বলছে—

অজিত-দা অজিত-দা, আমরা এসে পড়েছি—ঐ ক্যাম্প, ওঠ নামিগে। শালবনের ক্যাম্প তখন অসংখ্য রূপালী শাল-ফুল সূর্যের সোনালী আলোতে ঝল্‌সে উঠেছে। ওদের গন্ধে দিক্ আমোদিত হ'য়েছে। দূর থেকে কোকিলের মিষ্টি গলার আওয়াজ ভেসে আস্‌ছে—কূ-হু কূ-হু। মহুয়া ভাবতে ভাবতে নামলো বসন্ত দূরে নয়।

সমাপ্ত